পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৩

প্রদান উপলক্ষে

স্মা র ক গ্র ন্থ

সম্পাদনা

সুকুমার বাগচি

সহযোগী সম্পাদক **সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়** ❑ সহকারী সম্পাদক **বাসব রায়**

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

প্রাক্-কথন ॥ **শ্যামাশিস ভট্টাচার্য** ॥ ৭

সবিনয় নিবেদন ॥ **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৯

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ১১

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ ॥ **প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য** ॥ ১২

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ২০

রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প ॥ **বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য** ॥ ২১

To the East of Samatata ॥ Padmanath Bhattacharya ॥ ২৬

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে পদ্মনাথ : **নৃপেন্দ্রলাল দাশ** ॥ ৩৬

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **অজিৎ বরুয়া** ॥ ৩৯

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য** ॥ ৪০

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **হীরেন ভট্টাচার্য** ॥ ৪১

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **পবিত্র মুখোপাধ্যায়** ॥ ৪২

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **নীলমণি ফুকন** ॥ ৪৩

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত **তরুণ সান্যাল** ॥ ৪৪

২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক **হীরেন্দ্রনাথ দত্ত** ॥ ৪৫

২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক **স্বপন সেনগুপ্ত** ॥ ৪৬

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি ॥ সংকলন : **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৪৭

মতামত ॥ ৫২

সম্পাদকের নিবেদন

বর্তমান স্মারকগ্রন্থে বিশেষ সংযোজন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের গবেষণামূলক একটি ইংরেজি প্রবন্ধ, যা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৯২০ সালের জানুআরি সংখ্যায় প্রথম রচনা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রায় একশো বছরের পুরনো লেখাটির সন্ধান পাওয়া যায় বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবস্থিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের সঞ্চালক তথা কবি কমলেশ দাশগুপ্তের কাছ থেকে। আমাদের অনুরোধে তিনি অত্যন্ত যত্ন করে পত্রিকাটির প্রায় জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলির নিখুঁত জেরক্স কপি পাঠিয়ে ফাউন্ডেশনকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন; এই ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি। প্রবন্ধটি যথাযথভাবে পুনর্মুদ্রণের চেষ্টা করতে গিয়ে মূল পাঠ অনুযায়ী স্থানভেদে Shihli-Ch'atalo এবং Shih-li-ch'a-to-lo বানান দুটি অবিকৃত রাখা হয়েছে। তা ছাড়া বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ ব-এর পৃথক রূপ না-থাকায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে কয়েকটি উদ্ধৃতির বাংলা লিপ্যন্তরকালে আমরা অসমিয়া অন্তঃস্থ ব অর্থাৎ ৱ ব্যবহার করেছি।

তথ্যের খাতিরে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। শ্রী প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মারক বক্তৃতামূলক 'বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ' শীর্ষক নিবন্ধটিতে অসমের দ্বিতীয় রাজ্যভাষা হিসেবে বোড়ো-র উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত ড. ভট্টাচার্যের বয়সোচিত বিস্মরণের কারণে এ-ক্ষেত্রে তথ্যবিকৃতি ঘটেছে। বোড়ো ভাষা এই রাজ্যে সহযোগী সরকারি ভাষার স্বীকৃতি পায় ১৯৮৩ সালে, কিন্তু দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তারও বাইশ বছর আগে— ১৯৬১ সালে। অর্থাৎ বোড়ো অসমের দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় সরকারি ভাষা। বেশ কয়েকটি বোড়ো শব্দের বঙ্গানুবাদে সাহায্য করেছেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোড়ো বিভাগের প্রধান ড. ভূপেন নার্জারি, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এবার পুরস্কার প্রাপক দুজন কবি সহ এ-যাবৎ পুরস্কৃত মোট আটজন কবিরই সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্মারকগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে গতবছরের মতো না-হলেও এবারকার 'মতামত' বিভাগটিও অনেকটাই পুষ্ট। আশা করি, এই ধারা আগামী বছরগুলিতে অব্যাহত থাকবে।

স্মারক বক্তৃতা দুটির ঠিক আগে পদ্মনাথ ও রামনাথের সচিত্র পরিচিতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে আগেরবারের মতোই। শ্রী নৃপেন্দ্রলাল দাশের 'বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে পদ্মনাথ' শীর্ষক নিবন্ধটি বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য সংকলিত বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল, সে-কারণে সামান্য সংশোধন সহ সেটি পুনর্মুদ্রিত হল।

প্রতিটি রচনা সম্পাদনার সময় আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তবে উদ্ধৃতিগুলিতে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে এ-বছরও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের, বিশেষত রমানাথ ও শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি, এ-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। এবার সম্পাদনাকার্যে নানাভাবে সাহায্যের জন্য নবনিযুক্ত সহযোগী সম্পাদক শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রী বাসব রায়কে ধন্যবাদ।

প্রাক্-কথন

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের চতুর্থ বৎসরের অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, কেননা আমি মনে করি, এই উপস্থিতিই অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনাদের সীমাহীন ভালোবাসা প্রমাণ করে। রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই বার্ষিক অনুষ্ঠান মূলত বাংলা ও অসমিয়া ভাষার বিশিষ্ট কবিদের জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং উভয় ভাষার উল্লেখযোগ্য কবিদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

আপনারা অবশ্যই জানেন যে বার্ষিক এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আমরা দুটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছি। এগুলি হল সাহিত্যের দুটি বিষয়ে আমাদের দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের নামাঙ্কিত স্মারক বক্তৃতা। প্রতিবছর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কারণ রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাদের উদ্দেশ্য— গুয়াহাটি শহরের জ্ঞানী-গুণীদের কাছে স্মারক ভাষণমালা যতটা সম্ভব আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলা।

আমি বিশ্বাস করি, কোনো সাহিত্য প্রচেষ্টা তখনই সফল হয় যখন সেই প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্যিকরা জড়িত থাকেন। তাঁরা অংশ না-নিলে, আন্তরিকভাবে যুক্ত না-হলে, উৎসাহ না-দিলে কোনো সাহিত্য-প্রচেষ্টা, অনুষ্ঠান কিংবা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সে-কারণে এই ধরনের অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি শহরের সাহিত্যসেবীদের যুক্ত করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আমি একান্তভাবে প্রার্থনা করি যে মহানগরীর লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং বাংলা ও অসমিয়া ভাষাপ্রেমীরা আমাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত থেকে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানকে শহরের সেরা সাহিত্যানুষ্ঠান হয়ে উঠতে সহায়তা করবেন।

এই সম্পর্কের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি, বার্ষিক স্মারক বক্তৃতার শ্রেষ্ঠ বিষয় কী হতে পারে তা সম্ভাব্য বক্তার নাম সহ আমাকে সরাসরি লিখে জানান। আপনাদের ইতিবাচক পরামর্শের জন্য আমরা সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকব।

এই ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা কবি-সাংবাদিক সুকুমার বাগচি আমাদের অনুরোধে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সেজন্য তাঁকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমরা চাই বাংলা ও অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে চলুক। পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের সূচনাতেও তাই মহাপুরুষ মাধবদেবের বরগীতের সঙ্গে রাখা হয়েছে আমাদের অন্য এক স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ রচিত একটি সুপরিচিত ভক্তিগীতি। কামনা করি, সম্প্রীতির বাতাবরণে সকলের জীবন সুস্থ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

আজকের সন্ধ্যার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এটি উপভোগ্য হবে।

গুয়াহাটি,
৯ মার্চ ২০১৪

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সবিনয় নিবেদন

আমার নামে মুম্বাইয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি করণীয় কাজের সঙ্গে এই ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার ঘনিষ্ঠ দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (সম্পর্কে আমার পিতা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠতাত) এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের (সম্পর্কে আমার বাবার জ্যাঠতুতো দাদা) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ প্রতিবছর দুটি সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫১,০০০ টাকা, সেইসঙ্গে একটি স্মারক ও মানপত্র। পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে অসমিয়া ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে এবং রামনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। দুটি পুরস্কারপ্রাপকের নাম নির্বাচনের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সশ্লিষ্ট কবিদের সারাজীবনের কাব্যকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে গুয়াহাটিতে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের, এবং সম্ভব হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য কোনো প্রধান ভাষা-সংস্কৃতির, নির্দিষ্ট বিষয়ে ভাষণ দেবেন দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। স্মারক বক্তৃতা দুটির বিষয় নির্ধারণ করবেন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী ২০১০ সালের জন্য ২০১১-এর ১৩ মার্চ আয়োজিত পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে পদ্মনাথ ও রামনাথ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা ও শ্রী তরুণ মুখোপাধ্যায়। ২০১২ সালে ২৫ মার্চের অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন যথাক্রমে শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য। আর গতবছর ১৭ মার্চ আয়োজিত অনুষ্ঠানের বক্তা ছিলেন শ্রী অমলেন্দু চক্রবর্তী এবং শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

২০১৩ সালের পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত আজকের এই অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রী প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শ্রী বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য। এবার প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে প্রমোদবাবু ও বিশ্ববন্ধুবাবুর বক্তৃতা দুটি মুদ্রিত হল।

২০১৩ সালের জন্য পদ্মনাথ স্মৃতিপুরস্কার এবং রামনাথ স্মৃতিপুরস্কার ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুলে দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে কবি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কবি স্বপন সেনগুপ্তের হাতে। তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্টি অনুভব করছেন।

রমানাথ ভট্টাচার্য
সভাপতি
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি,
৯ মার্চ, ২০১৪

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

(১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্ম অবিভক্ত অসমের শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)। বানিয়াচং রাজবংশের সন্তান পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসম রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. পাশের পর সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত পাঠক্রম সমাপ্ত করে ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমের উজ্জ্বল রত্ন পদ্মনাথের কর্মজীবন শুরু হয় শিলঙে, ১৮৯৩ সালের ১০ নভেম্বর, রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে, সেখানে তিনি সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরমা উপত্যকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্স-এর কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১ জানুআরি শিলং ত্যাগ করেন। সিলেটে বাসকালে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তুলে দেন অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে, যিনি ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন পদ্মনাথের আর্থিক সহায়তায়।

যদিও পদ্মনাথ সিলেটের বিখ্যাত মুরারিচাঁদ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন, ১৯০৫ সালের জুন মাসে ইতিহাস ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসাবে গুয়াহাটির কটন কলেজে যোগদানের পরে তিনি বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কটন কলেজে থাকাকালীন তিনি এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'কামরূপশাসনাবলী' এবং 'মি. গেইট্'স হিস্টরি অব আসাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ৭ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (আসাম রিসার্চ সোসাইটি)। অসমের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে 'কামরূপশাসনাবলী' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ এবং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এবং 'অসম সাহিত্য সভা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পদ্মনাথকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করে, তবে 'অশাস্ত্রীয়' সারদা আইনের প্রতিবাদে এই খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

শেষজীবনে পদ্মনাথ কাশীবাসী হন এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত তাঁর দুটি বই ('আলোচনা চতুষ্টয়' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') প্রকাশ পায়। ❑

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ

প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য

অসমিয়া থেকে ভাষান্তর : **বাসব রায়**

ঐ আই ফাই ফাই আফা ফাই
জাংনি খ'র'নি জাংছিখৌ হাগার্‌ফাই
ছিজৌনি ছিরা চির্‌রা
বাথৌনি বান্দৌয়া বান্দোবা
থায়গিরনি বিখঙা খংবা
মৌন্‌ছিন্‌ছিন বৌরায়নি আছারাবৌ ফাংবা।' (বন্দনা)

মা গো আমার এসো
বাবা গো আমার এসো
আমাদের মাথার উপরের জটগুলো সরাও
ফণীমনসা গাছে শিরা পাঁচটা
বাথৌর বাঁধ পাঁচটা
চালতার খোসা পাঁচটা
ম'নিছিনছিন প্রভুর আচার পাঁচটা।
(ভাবানুবাদ)

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য অসম। এই রাজ্যটি প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ, কামাখ্যাদেশ প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এখানকারই প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম হলেন বোড়োরা। তাঁদের প্রধান আরাধ্য দেবতা বাথৌ বা শিব। পুজো-পার্বণে তাঁর উদ্দেশে উপর্যুক্ত মন্ত্র আওড়ানো হয়। এই মন্ত্র দিয়ে গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমে বোড়ো কবিতার বিকাশ সম্পর্কে আমি নিজের অনুভব ব্যক্ত করতে চাইছি। প্রাতঃস্মরণীয় মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের পবিত্র স্মৃতিচারণ উপলক্ষেই আমার এই বক্তৃতা, তাঁর উত্তরসূরি বিদ্যোৎসাহী অনুজ সুহৃদ শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্যের একান্ত অনুরোধ রক্ষা করাও আমার বক্তৃতার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বোড়ো কবিতার পটভূমি হল ছয় দশকের বেশি সময় ধরে চলমান বোড়ো ভাষার গবেষণা ও চর্চা। বিষয়ের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থায় পড়ে এই বোড়ো কবিতা নিয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে হয়েছিল। কিন্তু এভাবে বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষার মুখে কোনোদিন পড়িনি। গুরুজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভাষাবিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ শেখার সময় এই আপ্তবাক্য মাথায় ঢুকে গিয়েছিল যে, গদ্যের চেয়ে পদ্য অনেক এগিয়ে। অর্থাৎ কথার চেয়ে কবিতা বেশি শক্তিশালী। কবিতা মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির ধ্বনিময় প্রকাশ। কবিতা গভীরতম নীরবতার মধ্যে উজাড় করে দেয় আবেগ ও অনুরাগ। এরকমই কিছু সংজ্ঞা আমরা শুনেছি অধ্যাপক ও গুরুজনদের মুখে কিংবা তাঁদের লেখালিখিতে। এই প্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে, বাথৌ দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র আউড়ে বা সে-রকমই কোনো ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে আদিযুগে বোড়োদের ধ্যানধারণা প্রভাবিত হয়েছিল। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ সাধনই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। বোড়ো কবিতাতেও জীবনের এই লক্ষ্য প্রতিভাত।

বোড়ো সাহিত্যের আলোচনায় সাধারণত তিনটি পর্বে যুগবিভাগ করা হয়। অসমে ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই এই যুগগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : 'বিবার' (ফুল) যুগ (১৯২০-১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ), 'অলংবার' (তারা) যুগ (১৯৩৮-

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ) ও আধুনিক যুগ (১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)। গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা প্রসন্নকুমার বোড়ো খাকলারি প্রণীত ধর্মমূলক কবিতার বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। এটিই বোড়ো কবিতার বইয়ের প্রথম নিদর্শন বলে জানা গেছে। বোড়ো লেখক অমৃত খেরকটারির রচনা থেকে আমরা বইটির বিষয়সূচি সম্পর্কে জানতে পারি। বইটিতে 'গুরু খুলুমনায় গিছ' (গুরু প্রণামের গান), 'মোদায়নি হিসাব' (দেবতার সংখ্যা), 'বাথৌবৌরায়া মাথৌ খুরজিদাং' (বাথৌদা কাকে সৃষ্টি করেছেন) ও 'বুলি বুরৈয়া মানী বীর্‌বান সামিগিরি' (লক্ষ্মী কাকে বর দিয়ে থাকেন) ইত্যাদি বিষয়ক গীত-পদ সন্নিবিষ্ট রয়েছে বলে অমৃত খেরকটারি জানিয়েছেন।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বোড়ো ছাত্র সম্মেলন হাতে-লেখা একটি পত্রিকা বের করে। যার নাম 'বিবার লাইসি' (ফুল পত্রিকা)। ১৯২৪ সালে পত্রিকাটি প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটির আটটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন দোতমা অঞ্চলের বিশিষ্ট বোড়ো লেখক সতীশচন্দ্র বসুমতারি।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'খন্থায় মেথায়' (কবিতা ও গান) নামে গীতি ও কবিতার একটি সংকলন। এতে ছিল মোট পনেরোটি কবিতা। মূলত শিক্ষা, সমাজ, বোড়ো জাতির উন্নয়নই ছিল কবিতাগুলির বিষয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত লেখক রূপনাথ ব্রহ্ম ও মদারাম ব্রহ্মের যৌথ সম্পাদনায়।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় মদারাম ব্রহ্ম রচিত 'বর'নি গুদি সিবসা আরী আরজ' (বোড়োদের মূল আরাধ্য ও বন্দনা) নামে পৌরাণিক তত্ত্বমূলক একটি বই। বইটি দুভাগে বিভক্ত— সিবসা ও আরজ (ধর্ম ও প্রার্থনা); বইটিতে পদ্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে বোড়োদের ধর্ম ও স্তুতিমন্ত্র।

প্রখ্যাত কবি ঈশান মুসাহারি রচিত এগারোটি কবিতার সংকলন 'সনানি মালা' (সোনার মালা) 'বিবার' (ফুল) যুগের নব্য রোম্যান্স, প্রাকৃতিক ও জাতীয় ভাবধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'বাদারি' (কাঠুরে), 'মৌনাবিলি' (গোধূলি), 'গৌসৌ মৌব্লিব' (অস্থির মন), 'আলাখালা হারসিঙৈ' (নির্লিপ্ত একাকী), 'মৌদৈ' (অশ্রু), 'দুমথেনায় বিবারবারি' (সীমানাঘেরা ফুলের বাগান), 'বেংখা' (বাঁকা), 'হাজো' (পাহাড়), 'গৌথৈবারি' (শ্মশান), 'সিমান' (স্বীকারোক্তি), 'সম জাবায়' (সময় হল)— এই এগারোটি কবিতার সংকলন হিসাবে ঈশান মুসাহারির 'সনানি মালা' এক যুগোত্তীর্ণ অবদান। প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম সংকলিত-সম্পাদিত 'হাথরখি হালা' পত্রিকায় ঈশান মুসাহারির কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

'বিবার' ও' অলংবার' যুগের কয়েকটি বোড়ো পত্রিকার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য— 'বিবার' (ফুল), 'জেন্‌থখা' (মেহেন্দি গাছের ফুল), 'হাথরখি হালা' (তারামণ্ডল), 'অলংবার' (তারা), 'অখাফীর' (চাঁদ), 'বোড়ো লিরথুম বিলায়' (বোড়ো সংকলন পত্রিকা)। এই যুগের কয়েকজন কবি হলেন— রূপনাথ ব্রহ্ম, মদারাম ব্রহ্ম, ঈশান মুসাহারি, দ্বারেন্দ্র বসুমতারি, প্রমোদ ব্রহ্ম, কালীকুমার লাহারি, মণিরাম সানফ্রামহারি, জয়ভদ্র হাগজের, প্রমথেশ প্রমুখ।

প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম সম্পাদিত 'হাথরখি হালা' (তারামণ্ডল) পত্রিকায় ২২টি বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা স্থান পেয়েছে। এই সময়কালে প্রকাশিত হয়েছিল কালীকুমার লাহারি, মণিরাম সানফ্রামহারি প্রমুখ কবির কবিতা।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় 'খন্থাই বিহুং' (কাব্য সংগ্রহ) নামে কবিতার বইটি। ১৯৫১ সালে কালীকুমার লাহারি নামে এক লেখকের 'খন্থাই বিজাব' (কাব্য গ্রন্থ) নামে একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে মোট সতেরোটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু প্রেম, হাস্য, ব্যঙ্গ, উপদেশ ইত্যাদি।

বিবার ও অলংবার যুগের পর ১৯৫২ সালে বোড়ো সাহিত্য দিবস পালিত হয়। এর সূচনা থেকেই বোড়ো সাহিত্যের আধুনিক বা বর্তমান যুগ শুরু বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম সম্পাদিত 'সনাকি বিজাব' (শামুক গ্রন্থ) নামে একটি কাব্য-সংকলন। এতে স্থান পেয়েছে সমসাময়িক কালের প্রধান ও নবীন কবিদের ভিন্ন ভিন্ন আবেগ-অনুভূতির কবিতা।

১৯৭৫ সলে প্রকাশিত হয় ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম রচিত 'অখ্রাং গংসে নাংগৌ' (চাই একটি আকাশ) নামে কবিতার বইটি। এতে সংকলিত হয়েছে আধুনিক প্রতীকবাদী, বিপ্লবী ও সাম্যবাদী ভাবধারার কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থের জন্য ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম সম্মানিত হয়েছেন 'সমেশ্বরী ব্রহ্ম' পুরস্কার ও 'প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম জিউনাং বান্‌থা' (জীবনব্যাপী সাধনার জন্য প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্ম

পুরস্কার) সম্মানে। ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বিবার জানানৈ' (ফুল হয়ে) (১৯৭৫), 'আং ফাইফিনগৌন' (আমি ফিরে আসব) (১৯৯৫), 'বিবারী গাওদাং' (প্রস্ফুটিত পুষ্প) (২০০৮) ইত্যাদি। প্রণয় ও রোম্যান্সের ভাবসমৃদ্ধ সমর ব্রহ্ম চৌধুরীর কবিতার বই 'রাদাব্' (খবর) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র ব্রহ্ম ও কামাখ্যা ব্রহ্ম নার্জারির 'গুথাল' (ঢেউ) নামক কাব্যগ্রন্থ। প্রথমজনের কবিতার সংখ্যা ১৯ আর দ্বিতীয়জনের ১১। দুজনের কবিতাতেই ধরা পড়েছে দেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবধারা। কামাখ্যা ব্রহ্ম নার্জারির প্রতীকী কবিতার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'বনজার' (মশাল) কবিতাটি। ১৯৭৬ সালে নন্দেশ্বর বোড়ো রচিত 'গৌসৌনি বারহুংখা' (হৃদয়ের তুফান) ও 'সুবুংনি রাহা' (মানবিক পন্থা) নামে দুটি কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই দুটি কাব্যগ্রন্থ তাঁকে জনসাধারণের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কোকরাঝাড়ের প্রতিষ্ঠিত কবি প্রসেনজিৎ ব্রহ্মের 'আং থৈয়া' (আমি মরব না) নামক কাব্য-সংকলন সারস্বত সমাজে সমাদৃত হয়েছে। বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করতে বোড়ো ও ইংরেজি ভাষায় বেশ কয়েকটি সমালোচনামূলক বই লিখেছেন অধ্যাপক মধুরাম বোড়ো, ড. অনিলচন্দ্র বোড়ো, ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি প্রমুখ। এ-ছাড়া পত্রপত্রিকাতেও বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বোড়ো ভাষা-সাহিত্যের অধ্যয়ন সম্প্রতি শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত ভাষা হিসাবে বোড়ো ভাষা ওপরের সারিতে উঠেছে, সাহিত্য অকাদেমিও এই ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে কুড়ি শতকের শেষপর্বের বোড়ো ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার বই ও লেখকের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরলাম—

(১) রিংখাং (প্রতিধ্বনি)। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত। লেখক লকেন্দ্র বসুমতারি। ১৯৭০ সালেই প্রকাশিত হয় ধরণীধর ওয়ারিব রচিত 'মৌদৈ' (অশ্রু) নামক কাব্য-সংকলন। ১৯৭৫ সালে ফুলেন বোড়োর 'লাইমৌন' (তরুণী)। ১৯৭৬ সালে হরিহর ব্রহ্মের 'বেরেমৌদৈ' (মধু)। এই সময়েই প্রকাশিত হয় নন্দেশ্বর বোড়োর 'গৌসৌনি বারহুংখা' (হৃদয়ের তুফান), রামদাস বোড়োর 'ফৈফিন' (ফিরে এসো)। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত বাণেশ্বর বসুমতারির 'ডিমাপুর' (একটি স্থানের নাম), 'জাগ্মিবান' (বিদ্রোহী) এবং মনোরঞ্জন লাহারির 'মাব্লাবা' (কখনো) উল্লেখযোগ্য।

(২) ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় সাগ্রাম চৌধুরীর 'জিউনি লৈথোয়ায়' (জীবনের বন্যায়) ও উত্তমচন্দ্র খেরকটারির 'খন্থায় মালা' (কবিতার মালা) নামক দুটি কাব্য সংকলন। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় চন্দ্রকান্ত বোড়োর 'জিউলামা' (জীবনের পথ) ও গুণেশ্বর মুসাহারির 'হা ফিসা হৌয়া' (এক ধরনের বুনো পাখি)। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় অন্জু রচিত 'নৌংনি জিউ আংনি বিবুংথি' (তোমার জীবন আমার বক্তব্য) ও বিমলচন্দ্র ব্রহ্মের 'জাহার' (ঝাড়) নামক কাব্য- সংকলন। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় মানবকুমার রামসিয়ারির 'হায়নারী জাইখ্লং' (অপরূপ রামধনু) ও গুণেশ্বর মুসাহারির 'ফেরেংগা দাও' (এক ধরনের কালো পাখি) নামক কবিতার বই দুটি। ১৯৮৫ সালে রমাকান্ত বসুমতারির 'দাওহানি খন্থায়' (যুদ্ধের কবিতা) ও রাজেন্দ্রনাথ বোড়োর 'বৌদীর' (উতলা মন) প্রকাশিত হয়।

(৩) ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে অরবিন্দ উজীরের 'মৌন্দাংথিনি রৌজাবথায়' (অনুভবের গান) এবং অন্জুর 'ফাসিনি দোলেঙাও অখাফৌর' (ফাঁসে ঝুলন্ত চাঁদ)। পরবর্তীকালে আর সাম্প্রতিক সময়ে বোড়ো সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ হিসাবে বোড়ো কবিতার রচনা, চর্চা ও বিকাশ হয়েই চলেছে।

অসমের রাজ্যভাষা অসমিয়া। এ-রাজ্যে দ্বিতীয় রাজ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত বোড়ো ভাষা। এই ভাষা মূলত বোড়োল্যান্ড স্বশাসিত পরিষদ অর্থাৎ এর অন্তর্গত চারটি জেলায় সহযোগী রাজ্যভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এ ছাড়া গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্গত হয়েছে বোড়ো ভাষা। সাহিত্য অকাদেমি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত হয়ে বোড়ো ভাষা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। বোড়ো সাহিত্য সভা, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কোকরাঝাড়ে স্থাপিত বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর স্তরে বোড়ো ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন, গবেষণা কর্মসূচি সুশৃঙ্খলভাবে চলছে। আমাদের বি. বরুয়া কলেজের স্নাতক তথা সংস্কৃত ভাষার মেধাবী ছাত্র আয়ুষ্মান মধুরাম বোড়ো পুণের ডেকান কলেজ থেকে ভাষাবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। এরপর তিনি বোড়ো ভাষা-সাহিত্যের প্রচুর গবেষণামূলক বইপত্র ইংরেজি, অসমিয়া ও বোড়ো ভাষায় লিখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই কৃতিত্বে আমার খুব আনন্দ হয়। মহিশূরের কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থা ও পুণের ডেকান

কলেজের মাধ্যমে বোড়ো ভাষার চর্চা ও গবেষণা করছেন বোড়ো সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পণ্ডিত ও ছাত্রছাত্রী। বোড়ো ভাষা-সাহিত্য নিয়ে বইপত্র প্রকাশ ও আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়েছে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে মধুরাম বোড়োর প্রভূত অবদান রয়েছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক রোহিণীকুমার মহন্তের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আরও কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। এঁরা হলেন ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ড. বাণীকান্ত শর্মা, ড. সত্যেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী, ড. ভূপেন্দ্র নার্জারি, বোড়ো বিভাগের বর্তমান অধ্যাপক ড. স্বর্ণলতা দৈমারি সহ অন্যান্য অধ্যাপক। এঁদের সহযোগিতাতেই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোড়ো ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বহুমুখী চর্চা হচ্ছে। একই সঙ্গে স্বাগত জানাই ভাষাবিজ্ঞানী ড. জ্যোতি তামুলি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ড. উমেশ ডেকার অবদানকে। লোকসংস্কৃতি গবেষণা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিল বোড়ো ইংরেজিতে বোড়ো লোকসংস্কৃতির গবেষণা আর বোড়ো সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানাই।

প্রকাশিত যাবতীয় বইপত্র ঘেঁটে দেখার সময়-সুযোগ আমার নেই। তবু সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'বোড়োল্যান্ড' নামে বোড়ো-অসমিয়া মাসিক পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা আমার হাতে এসেছে। আমাদের বি. বরুয়া কলেজের কৃতী ছাত্র ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি (রঙিয়া কলেজের অধ্যাপক) 'বোড়োল্যান্ড' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'বোড়ো সাহিত্য : অতীত ও সাম্প্রতিক ধারাবাহিকতা' বিভাগে। সেগুলি পড়ে আমি বড়ই আনন্দিত আর উপকৃত হয়েছি। আমার গবেষণাগ্রন্থ তথা প্রয়াত বোড়ো লেখক ভবেন্দ্র নার্জারির রচনাবলি, অধ্যাপক ড. প্রফুল্লদত্ত গোস্বামীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখালিখি, ড. বাণীকান্ত কাকতি, ড. বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মহত্ত্বপূর্ণ রচনাবলির উপর নির্ভর করে প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতার নিদর্শন হিসাবে কয়েকজন কবির কবিতার ভাবানুবাদ পেশ করছি। এই কবিরা হলেন প্রয়াত রূপনাথ ব্রহ্ম, মদারাম ব্রহ্ম, ঈশান মুসাহারি, প্রসেনজিৎ ব্রহ্ম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বোড়ো কবিতাগুলির আড়ালে যে-সমাজ বিদ্যমান, তা ভারতের অসমিয়া, বাংলা ইত্যাদি সংবিধান-স্বীকৃত ভাষার মতোই ব্রিটিশ শাসনাধীন বা তার পূর্ববর্তী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন নির্বাহের পরিচায়ক। ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়, মোঙ্গলয়েড কিরাত, অস্ট্রোলয়েড শবর গোষ্ঠীর জনগণের উপর ভারতবর্ষীয় নর্ডিক আর্য হিন্দুর ধর্মীয় প্রভাব কম-বেশি পড়েছে। এ-দিকে ভারতের আর্য ও অনার্য জনগণের জীবন, চিন্তাধারা, প্রকাশভঙ্গি, সংগীত, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদিতে পড়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাবসা-বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা ও ব্রিটিশরাজের বহুমুখী প্রভাব। ব্রিটিশ যুগে খ্রিষ্টান পাদরিদের মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার হয়েছে।

এ-ছাড়া কবিতার ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রভাব পড়েছে তন্ত্রমন্ত্র, শ্লোক, গীতিকা, দৃষ্টান্ত, প্রবাদ-প্রবচন, গল্পগাথা ইত্যাদির। ড. প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী ও আমার লেখা ভূমিকা-পরিশিষ্ট সংকলিত দুটি বই আছে প্রয়াত ভবেন্দ্র নার্জারির। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত এই দুটি বইয়ের নাম 'বোড়ো কছারির (কাছাড়ির) জন সাহিত্য' (১৯৫৭) ও 'বোড়ো কছারি সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৬৬)। বই দুটিতে প্রচুর সাহিত্যিক-সামাজিক ও ভাষাগত তথ্য-উপাদান তুলে ধরা হয়েছে। নিদর্শন হিসাবে বোড়ো কবিতার ভাবানুবাদ তুলে ধরলাম। রাজর্ষি-প্রতিম রূপনাথ ব্রহ্ম রচিত 'ঈশ্বরনি নাম গদৈ' (ঈশ্বরের নাম মিষ্টি) কবিতাটির ভাবানুবাদ :

ঈশ্বরের নাম মিষ্টি
পিতা ঈশ্বরের নামের মতো
মিষ্টি আর কিছু নেই।
হায়! সেটাই জেনো মূল কথা।
হঠাৎ একবার তাঁর নাম নিলে
হঠাৎ একবার তাঁর নাম আওড়ালে
আবার একবার নাম নিতে
আবার একবার নাম আওড়াতে
ইচ্ছে হবে।
দুঃখের সময়ে বিপদের কালে
তোমার মনে শান্তি দেবে।
পিতা ঈশ্বরের নামের মতো
মিষ্টি আর কিছু নেই।
হায়! সেটাই জেনো মূল কথা।
সন্তান-সন্ততি আসল নয়,
সংসারের সুখই সুখ নয়।
সুখ পাবে অল্প সময়
দুঃখ আসবে তারই পরে।
পিতা ঈশ্বরের মিষ্টি নাম

মানুষ যে নেবে কবে?
হায়! যতক্ষণ নেবে
ততক্ষণ সুখ লাভ করবে।
হে পিতৃজনেরা! হে মাতৃজনেরা!
সেই পিতার নামই সার কথা।
পিতা ঈশ্বরের নামের সমান
সুখ নেই, মিষ্টিও নেই।

ধর্মীয় অনুভূতি সহ এভাবেই পরম শক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন কবি রূপনাথ ব্রহ্ম। ১৯২৩ সালে মদারাম ব্রহ্মের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁর 'খন্থায় মেথায়' (কবিতা ও গান) নামক কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শই প্রতিভাত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে তুলে ধরলাম 'বোড়োল্যান্ড' পত্রিকার (ফেব্রুআরি ২০০৩) 'বোড়ো কবিতার ধারাবাহিকতা' বিভাগে প্রকাশিত রঙিয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারির সুচিন্তিত মতামত :

'বোড়ো ভাষায় লিখিত কবিতার পরম্পরা শুরু হয়েছিল পদ্যধর্মী রচনা দিয়ে। পদ্যধর্মী হলেও এগুলির সাহিত্যিক তথা নান্দনিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা ওই পদ্যগুলিতে রয়েছে আলংকারিক গুণ। তা ছাড়া সেগুলি রচিত হয়েছে বিভিন্ন ছন্দসজ্জায়।'

উল্লেখ্য, 'বিবার' পত্রিকায় বাংলা আর অসমিয়া ভাষায় কবিতা প্রকাশ করে সমন্বয়ের আদর্শও তুলে ধরা হয়েছিল।

১৯২০ সালে প্রকাশিত প্রসন্নকুমার বোড়ো খাকলারির 'বাথুনাম বৈখাগুনি গীদু' (বাথৌ বন্দনা বিহু গীত) বইটি থেকে পয়ার ছন্দের নমুনা হিসাবে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরলাম :

মায়নো বুড়ী বিমান বুড়ী আই নুং জুংনি।
বব-বাঞ্জা হবায় থায়ু নায়ো থানানি।।
খাংখালা খারি খারি ভগমাথানি আলি।
মাখানানি বিবাগ আইনি নাকবালি।।

ভাবানুবাদ :

লক্ষ্মীদেবী তুমি, আমার মা তুমি।
আশীর্বাদ দিয়ে যাও ঘরে থেকে তুমি।।
খাংখালা বনের সারি সারি বসুমতীর আলি।
'মাখনা'র ফুলই মায়ের নাকছাবি।।

সেই সময়ে বাংলা লিপির ব্যবহার হত। মদারাম ব্রহ্ম আর রূপনাথ ব্রহ্মের পদ্য রচনার অন্তরালে জাতীয় প্রেম, ঈশ্বরভক্তি ও মানবতাবোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রূপনাথ ব্রহ্মের রচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'-র অনুরণন তথা ভাবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি যার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন :

হায় তুমি কে?
হৃদয়ের নিভৃত কোণে রয়ে
ছেরজা বাজাও গগলিংগ (সারেঙ্গিতে বাজাও চিলের
মতো এক পাখির কান্নার সুর)
হায় তুমি কে?
দেখি কি দেখি না ধোঁয়াশা
আসে কি আসে না মরীচিকা
হায় তুমি কে? (রূপনাথ ব্রহ্ম)

তুলনীয় :

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
(রবীন্দ্রনাথ)

এ-প্রসঙ্গে ঈশানচন্দ্র মুসাহারি ও প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্মের কয়েকটি কবিতার উৎকর্ষ বিচার করে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন ড. বসুমতারি। ঈশানের কবিতাগুলি হল— 'বাদারি' (কাঠুরে), 'হাজৌ' (পাহাড়), মৌনাবিলি (সন্ধ্যা/গোধূলি)। প্রমোদ ব্রহ্মের কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে 'হায়েমনি চুফিম' (সমতলের সুরেলা সুর), 'দৈ বাজুম' (জলপ্রপাত) ইত্যাদি।

ঈশানচন্দ্র মুসাহারির 'বাদারি' নামক উৎকৃষ্ট কবিতাটির অসমিয়ায় ভাবানুবাদ করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারি। সেটাই এখানে বাংলায় তুলে ধরলাম :

সূর্য ডুবেছে
সন্ধ্যা নেমেছে।
'যাসনে আর পানসি'
ওই যে বলল চিৎকার করে।
'হায় এ কোন্ গ্রাম
এসেছি আমি ইনিয়ে বিনিয়ে'
— হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম
যখন আমি এভাবে

কলস ভরা গাগরি
কাঁখে নিয়ে
বেদনা বিধুর মনে
যুবতী গেল দূরে সরে।
সাঁঝের মেঘলা আকাশে
সূর্য ডুবলে
তুমি যে কী অপরূপ গ্রাম
চিরদিন থাকবে যে মনে।

প্রথিতযশা কবি প্রমোদচন্দ্র ব্রহ্মের 'দৈ বাজুম' কবিতার ভাবানুবাদ :

রা রা রা রা
রৌ রৌ রৌ রৌ
জাম জাম জুম জুম
গ্রৌ গ্রাও গ্রৌ গ্রৌ
বাঁধ ভেঙে
খুঁজেছি আমি
চিরদিনের ঠাঁই।

কেটে ছেঁটে সাফ করে
দুরন্ত নদ আমিই ব্রহ্মপুত্র
দাও দাও আমায় পথ ছেড়ে
কেউ যেন আমাকে মারছে সপাটে
কেউ যেন আমাকে ধরেছে টেনে
কিছুই জানি না আমি
এগোতে হয় বলে এগিয়ে যাচ্ছি
গতিই আমার লক্ষ্য
পথ যা-ই হোক-না কেন গতির শেষ অবধি
দাও দাও আমায় পথ ছেড়ে।
সমস্ত সৃষ্টি ধাবমান হলে
হে ব্রহ্মাণ্ড, আমিই একলা অলস হয়ে থাকব কি?
তোমার ইচ্ছানুযায়ী?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ
এই দ্যাখ, তোর মাথার ওপর দিয়েই ঝাঁপাই
দাও দাও আমায় পথ ছেড়ে।
কেউ-বা করছে আরতি অজানা থানে
খাম, জথা, সিফুং বাজিয়ে
সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমিও এগোই
দুরন্ত নদ আমিই ব্রহ্মপুত্র
দাও আমায় পথ ছেড়ে
রা রা রা
রৌ রাও রৌ রাও...

অসমিয়া কবিতার ক্ষেত্রেও আধুনিক যুগের শিউলি কবি রত্নকান্ত বরকাকতি, রোমান্টিক কবি নবকান্ত বরুয়ার ওপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়। অসমের বরেণ্য শিল্পী শোভারাম ব্রহ্ম বোড়ো ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ ও প্রকাশ করে চিরন্তন কীর্তি স্থাপন করেছেন। একের পর এক বোড়ো কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। সাহিত্য অকাদেমি, সংগীত নাটক অকাদেমি, ললিতকলা অকাদেমির ক্ষেত্রে অসমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি, খাসি প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠীর সৃষ্টিরাজি স্বীকৃত ও সমাদৃত হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে আমাদের আশঙ্কা, নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা তথা কলকাতার আঞ্চলিক কার্যালয় নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে কৃতকার্য হতে পারেননি। কেন্দ্র তথা রাজ্য স্তরে আরও বেশি যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়েও নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা তথা ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কবিতা সহ যাবতীয় সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিবিম্ব সে-জন্য সমাজের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার ভিত্তিতেই সৃষ্টি, বিকাশ আর পর্যালোচনা যুগোপযোগী তথা সর্বজন সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শুধু কবিতাই নয়, বোড়োদের সামগ্রিক সাহিত্য, চারুকলা, সংগীত, নাটক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

১৯৫২ সালের ১৬ নভেম্বর বোড়ো সাহিত্য সভা (বোড়ো থুনলাই আফাদ) স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বোড়ো ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, বিকাশ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে 'অভিলাষী জাগরণ' সৃষ্টি হয়েছে। যা সম্ভব হয়েছে প্রসেনজিৎ ব্রহ্ম, সমর ব্রহ্ম চৌধুরী, মনোরঞ্জন লাহারি, কমলকুমার ব্রহ্ম, নীলেশ্বর, জোসেফ দৈমারি প্রমুখের জন্য। বোড়ো ভাষার গবেষণা, অধ্যাপনা, চর্চা ও ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়নের অবিরত যাত্রায় ১৯৫১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত গুরুর কৃপায় যথাসাধ্য ব্রতী হয়ে পুণ্যকর্ম করেছি বলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করছি। ১৯৫২ সাল থেকে 'অখাফীর' (চাঁদ), 'বোড়ো লিরথুম বিলাই' (বোড়ো সংকলন পত্রিকা) ইত্যাদি পত্রপত্রিকা প্রকাশ হয়েছে। 'বোড়ো থুনলাই

আফাদ'-এর (বোড়ো সাহিত্য সভা-র) স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবি সম্মেলন হয়েছে। গঠিত হয়েছে বোড়ো পাঠ্য বই সমিতি। ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে অবিরত সাহিত্য সেবা, বোড়ো ভাষার লিখিত রূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে লিপি বিষয়ক আন্দোলন, রাজ্যভাষা হিসাবে বোড়োর মর্যাদা লাভের গণসংগ্রাম, সাহিত্য অকাদেমির স্বীকৃতি, পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, গবেষণা কর্মসূচি, অভিধান প্রণয়ন কর্মসূচি— এ-সবের জন্য বোড়ো জনগণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ও সর্বভারতীয় বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা রয়েছে। এগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আর পর্যায়ক্রমে সমস্যা সমাধানের সাক্ষী হয়ে আমাদের মনে হয়েছে, অতীতের বোড়ো ও বোড়োপ্রেমী লোকেদের ঐকান্তিকতা ও স্বদেশপ্রীতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বহু শহিদ ও জাতীয় নেতার অনবদ্য অবদানও আমার মানসপটে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হলেন— ধর্মগুরু কালীচরণ ব্রহ্ম, বোড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, রাজর্ষি রূপনাথ ব্রহ্ম, পদ্মশ্রী মদারাম ব্রহ্ম, সমাজসেবী সতীশচন্দ্র বসুমতারি, অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরী, কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, রামদাস বসুমতারি, লক্ষেশ্বর ব্রহ্ম, মোহিনীমোহন ব্রহ্ম, বিনেশ্বর ব্রহ্ম, রামচরণ ব্রহ্ম, মঙ্গলসিং হাজোয়ারি, ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, ভবেন্দ্র নার্জারি, কামেশ্বর ব্রহ্ম, মঙ্গলচণ্ডী ব্রহ্ম, রমেশচন্দ্র বোড়ো, বীরেন্দ্রনাথ দাস বোড়ো, রতিকান্ত স্বর্গিয়ারি, জয়ভদ্র হাগজের, সোনারাম থাওসেন, রাজেন্দ্রলাল নার্জারি, যাদবচন্দ্র খাকলারি প্রমুখ। জনগোষ্ঠীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মপ্রচার ও সমাজসেবার প্রতি বহুমুখী অবদান রয়েছে ব্রিটিশযুগের বিদেশী মিশনারি সহ প্রকাশক-লেখক-চিকিৎসক প্রমুখের। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন, রেভারেন্ড সিডনি অ্যান্ডেল, জে. ডি. হ্যান্ডারসন, রেভারেন্ড হলভর শ্রদ্দ, দীনেশচন্দ্র নার্জারি প্রমুখের নাম আমার ইংরেজি গবেষণা গ্রন্থের (প্রকাশকাল ১৯৭৭) প্রথম সংস্করণেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে বোড়ো সাহিত্য সভার মুখপত্র 'বোড়ো' পত্রিকার প্রকাশ যথেষ্ট সুযোগ এনে দিল সাহিত্যসেবীদের। কবিতার বিষয়বস্তু, ছন্দসজ্জা, উপমা ইত্যাদি অলংকারের প্রয়োগ সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত ক্রমশ এগিয়েছে। কটন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টায় রণেন্দ্রনারায়ণ বসুমতারির সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অখাফৌর' (চাঁদ) (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকাটি নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। সমালোচক ড. ফুকনচন্দ্র বসুমতারির উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি, "এতে প্রকাশিত কবিতা ও ছোটগল্প সেই সময়কার সৃষ্টিশীল বোড়ো সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।" উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রসেনজিৎ ব্রহ্মের 'আং থৈয়া' (আমি মরব না) এবং সমর ব্রহ্ম চৌধুরীর 'চিজৌ গেরেমচা' (অমর চিজৌ) কবিতা দুটির বিষয়বস্তু যেমন অনন্য তেমনই মুক্তক ধরনের ছন্দের ব্যবহারে তা সোনায় সোহাগা হয়েছে।

'আং থৈয়া' (আমি মরব না) কবিতাটির আংশিক ভাবানুবাদ তুলে ধরা হল নিদর্শন হিসাবে।

এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া আমি
সেই ডাইনোসর নই
অথবা সাইবেরিয়ার উঁচু বুকের নিভৃত স্থানের
শুকনো নির্জীব ম্যামথ নই
আমি সেই অনাদিকালের
মামুলি ফসিলও নই
আমি আফ্রিকার ডোডো পাখিও নই
কাজিরাঙার গন্ডার নই।
চাই না আমার
জুলজিক্যাল মিউজিয়াম
ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট,
আমি মানুষেরই একজন
আমি মানব
সৃষ্টির আদিকাল থেকে
আজ পর্যন্ত চলে আসা
মৃত্যুহীন মানব।

উচ্চ পর্যায়ের এক রোমান্টিক কবি সমর ব্রহ্ম চৌধুরীর 'মহাবুদ্ধনি তপস্যা' নামক কবিতার ভাবানুবাদ তুলে ধরলাম প্রজ্ঞা বন্দনার নিদর্শন হিসাবে :

সোমাশ্রী, ছাইরঙা ধূসর রাত
হিংস্র বাঘের মতো চোখে জ্বালিয়ে আগুন
মহাবুদ্ধের মতো তপস্যায় আমি মগ্ন
মহাবুদ্ধের তপস্যা...
হায় ভগবান, রাত পোহাতে আর কত দেরি?
হৃদয়ে কাঠুরের কুটিরে প্রজ্বলিত

গভীর অরণ্যের একটু আগুন।
তবু আমি যেন দুচুমায় বিলের জলাধার
স্রোতবিহীন অচল নিথর নিঝুম নীরব।

(বোড়োল্যান্ড : মার্চ ২০১৩)

আরও একজন রোমান্টিক কবি মনোরঞ্জন লাহারির 'মিথিংগা' (প্রকৃতি), 'হৈ ফৈছালি' (হে দিগন্ত) ইত্যাদি কবিতার আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য। যেমন :

সাগরের বহতা স্রোতের
আমি এক ফোঁটা জল
জীবন আমার দুদিনের
তুমি চিরদিনের
আমি এখনই এসেছি এখনই যাব
হে প্রকৃতি
আমার শুধু এটাই প্রার্থনা
আমার মৃত্যু হলে তোমার শীতল বুকে
যেন দিয়ো একটু ঠাঁই। (মিথিংগা)

বোড়ো সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্মের সত্তরের দশকের আধুনিক কবিতার নিদর্শন হিসাবে 'চাই একটি আকাশ' নামক কবিতাটির ভাবানুবাদ পেশ করছি :

একটি নীল আকাশের আকাল আমাদের
আজ আমাদের চাই
পবিত্র মুক্ত সমীর
যার হৃদয়ে কখনো ধ্বনিত হয় না
সংকীর্ণ সীমার আকাশ।
পূর্ণ হল যেখানে রিক্ত কায়া
হলাহল ওগরায় সেখানেই ক্ষুধাতুর হিয়া।
সেজন্যই আজ
ইতিহাসের সেই চারটি রঙের আভা
বিচিত্র তার ঘৃণ্য রেখা
সেই অর্থের বিভ্রান্ত চিন্তা
তারই অমৃতবৃক্ষে বিষফল।

'অখ্রাং গাংচে নাংগৌ' (চাই একটি আকাশ) (১৯৭৫) নামক কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে আধুনিক বোড়ো কবিতার এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছেন ব্রজেন্দ্রকুমার ব্রহ্ম। তাঁর 'বাল্মীকি' কবিতাটি উচ্চ প্রশংসিত।

নয়ের দশক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিজয় বাগলারি, অন্‌জু, অরবিন্দ উজির, রমাকান্ত বসুমতারি, অনিল বোড়োর আধুনিক কবিতাগুলি রূপ-রস, সাজসজ্জা, মুক্ত ছন্দ, কথা ছন্দ, প্রতীকী ভাষার প্রয়োগে এক বিচিত্র জগৎ গড়ে তুলেছে। অরবিন্দ উজিরের 'গিনার' (ভয়), 'চাঁদাবনি চালের' (শব্দের শরীর) ; অন্‌জুর 'গাঁবা দৈমা' (হৃদয় নদী) সাম্প্রতিক বোড়ো কবিতার অপরূপ নিদর্শন। অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা কবিতাও আছে বোড়োতে। সীতানাথ ব্রহ্ম চৌধুরীর লেখা ফুলেশ্বরী দৈমারি বিষয়ক কবিতাটি অসমিয়াতে রচিত হলেও, বোড়ো ভাষায় এর প্রতিরূপ মনোগ্রাহী হবে নিশ্চয়ই।

দেখা যাচ্ছে, অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দির মতো বোড়ো কবিতাতেও বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞানের পটভূমি। এগুলিতে ভাব-রস-ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগের মাধ্যমে জয়যাত্রার সূচনা করেছে বোড়ো কবিতা। বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ নিয়ে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে কয়েকটি মাত্র বিষয় তুলে ধরলাম।

ভারতে আদিকবি বাল্মীকির যুগ থেকে মহাকবি কালিদাস প্রমুখের মাধ্যমে বহমান রসাত্মক-ধ্বন্যাত্মক কাব্যপ্রবাহে মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য, মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ আরাধ্য পূর্বপুরুষের প্রতি হৃদয়ের বন্দনা জ্ঞাপন করছি কবিরাজ মাধব কন্দলির ভাষায়—

সমস্ত রসক কোনে বুজিবাক পারে।
কবি সব নিবন্ধয় লোক ব্যবহারে।

'বহুজন হিতায়' নীতিতে এগিয়ে গেলে সর্বজনের হিতসাধনের পথ খুলে যাবে। আর সেটাই আমাদের শিবরূপী কিরাত ও উমারূপী শবরীর চরণে নিবেদন। ❑

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

(১৮৯৪-১৯৫৫)

বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্র, রবিবার। পিতা বিরজানাথ ছিলেন ক্যত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। সেখানে রামনাথের ছেলেবেলা কেটেছে বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। শৈশবে পড়াশোনা হয়নি। প্রায় আট বছর বয়সে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই প্রয়াত। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হত। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

বানিয়াচং হাইস্কুলে পড়াশোনার পরে তরুণ বয়সেই বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত হন রামনাথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলি পল্টন'-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেন ১৯২৪ সালে। সাত বছর পরে, যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন তখন ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলে তাঁর বিশ্ব-পর্যটন শুরু হয়। অদম্য ভ্রমণস্পৃহায় রামনাথ চারটি মহাদেশ সফর করেন সাইকেলে চেপে এবং বেশ কয়েকবারের পর্যটনে ওইসব দেশের কারুজীবী, শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

যদিও রামনাথ বিদ্যালয়জীবনের পরে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বাংলা ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আমরা কামাল পাশার পুনর্গঠিত তুরস্কের বিষয়ে জানতে পারি এবং আধুনিক চিনের বিশাল তৎপরতার বিষয়েও তিনিই বাঙালি পাঠকদের প্রথম অবহিত করেন। অর্থবল না-থাকায় বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কতবার কতরকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারও চিত্তাকর্ষক বিবরণে তাঁর ভ্রমণকাহিনিগুলি সমৃদ্ধ।

ভ্রমণকাহিনি-রচয়িতা হিসাবে রামনাথের অনন্যতা যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনই ভূপর্যটক হিসাবেও তিনি সার্থকনামা। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে 'তরুণ তুর্কী', 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'জুজুৎসু জাপান', 'ইরানের আর্য' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ❑

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" ('আধুনিক কাব্য', বৈশাখ ১৩৩৯) 'মর্জি' অর্থাৎ মনোভাবই হল আসল কথা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন পালটায়, সমাজ পালটায়, কাব্যের বিষয় পালটায়, অনিবার্যভাবে তার ভাষাও পালটায়। এই 'বাঁক নেওয়া' সময়টিই আধুনিকতা। পাঠকের 'মর্জি' পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটে কবির সৃষ্টিতেই। তিনিও যেহেতু যুগের সৃষ্টি তাই তাঁর আগের কালটি থেকে তিনি তো অনিবার্যভাবেই এগিয়ে থাকবেন। মনোভাব পালটানো মানে বিষয় পালটানো, আর কবিতায় বিষয় যখন পালটে যায় তখন তার প্রকাশের মাধ্যমও পালটে যায়। কবিতার ক্ষেত্রে এ-কথা বেশি সত্য।

মনোভাব প্রকাশের জন্য কবিকে ভাষার সাহায্য নিতে হয় ঠিকই, কিন্তু ভাষার মধ্যে তাঁকে সৃষ্টি করতে হয় 'ভাষাতীতের ব্যঞ্জনা'। এই ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য কবিকে কখনো শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতে হয়। কখনো-বা শব্দকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তার ভিতর থেকে অন্য অর্থের আভাস ফুটে ওঠে। আর যাকে উপমা বলা হয় সেই একই লক্ষণ-বিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা তো আছেই।

এ-ছাড়া কাব্যের আলোচনায় 'রূপকল্প' বা 'চিত্রকল্প' শব্দ দুটিও ঘুরে-ফিরে আসে। 'কল্প' শব্দের একটা অর্থ 'সদৃশ' বা 'মতো'। তাই যেখানে কথা দিয়ে কবিতায় ছবি আঁকা হয় অথবা শব্দ দিয়ে রূপজগতের আভাস সৃষ্টি করা হয় সেখানেই 'চিত্রকল্প' বা 'রূপকল্পের' সূচনা। আপাতদৃষ্টিতে দুটি পৃথক হলেও প্রকৃত অর্থে দুটি একই। শুধু আধুনিক কালেই নয়, কাব্যসৃষ্টির সূচনাপর্ব থেকেই কবিতায় উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটে আসছে। নইলে সাধারণ বাক্যের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য থাকত না।

এ-সব তথ্য অনেকেরই জানা। তাই অকারণ ভূমিকা না-বাড়িয়ে মূল আলোচনায় আসা যাক। যেখানে আলোচ্য বিষয় 'আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্পের ব্যবহার' সেখানে আধুনিকতার সময় নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র ভূমিকাতে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক।" অর্থাৎ বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাতও তাঁরই হাতে। তাই 'লিপিকা'-র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা। বুদ্ধদেব ঠিকই করেছিলেন, তবে 'ক্ষণিকা'-র 'বোঝাপড়া'-র মতো কবিতা সংকলনে থাকলে হয়তো ভালো হত। কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন যে 'ক্ষণিকা'-তেই তিনি বাংলা কবিতায় আধুনিকতা নিয়ে এলেন। তবে 'লিপিকা'-য় যেহেতু তিনি গদ্যকবিতার একটি ভবিষ্যৎ-প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়ে গেলেন তাই তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। 'লিপিকা'-র প্রথম রচনায় ('সন্ধ্যা ও প্রভাত') অসামান্য উপমা-প্রয়োগ প্রথমেই নজরে আসে— "অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা/বাসরঘরের দ্বারের পাশে অবগুণ্ঠিতা নববধূর

মতো।" চিত্রকল্প বা রূপকল্প যা-ই বলি-না কেন, 'বলাকা'-র একটি কবিতায় এই অসামান্য পঙ্‌ক্তিগুলি এখনও অবিস্মরণীয়— "চাহি সেই দিগন্তের পানে/শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।" অথবা, 'শেষ লেখা'-র 'ধূসর গোধূলিলগ্নে' কবিতার সেই চমক-লাগানো পঙ্‌ক্তিগুলি—

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—

এখানে জীবন ও মৃত্যুর একাত্মতা বোঝানোর জন্য আশি বছরে পা-দেওয়া কবি যে-রূপকল্পের সাহায্য নিয়েছেন তা সমসাময়িক তরুণদের অনেকেরই আয়ত্তাধীন ছিল না।

বুদ্ধদেব বসুর দোহাই দিয়ে আধুনিকতার চর্চায় রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনলেও এবারে 'স্বীকৃত' আধুনিকদের কথাই ভাবতে হবে। এবং অবশ্যই এর পুরোভাগে থাকবেন জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু তার আগে বাংলা কবিতায় যথার্থ আধুনিকতার সূচনার পটভূমিকাটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মকাল বলে ধরে নেওয়া হয়। ওই সময়ের কবিদের উপর দেশজ প্রভাব তেমন কাজ করেনি, বিদেশী কবিরা ছিলেন অনেকেরই আদর্শ। দীর্ঘ আলোচনা এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় কবিরা, বিশেষ করে এলিয়ট, ইয়েট্‌স বা ফরাসি কবি মালার্মে আধুনিক কবিদের অনেককেই প্রভাবিত করেছিলেন। এলিয়ট আধুনিক জীবনের নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণাকে বিভিন্ন উপমা ও রূপকল্পে প্রয়োগ করেছিলেন। নিঃসঙ্গ আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা প্রকাশের ভাষাকে তিনি শুকনো ঘাসের ওপর বয়ে-যাওয়া বাতাসের শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন (As wind in dry grass), আর মালার্মে তো সরাসরি কবিতাকে শব্দপ্রধান বলে তার ভাবপ্রাধান্য উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর মতে, শব্দ দিয়েই চিত্রকল্প বা রূপকল্প রচিত হবে, ভাবের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই (Poetry is written with words, not with ideas)। আধুনিক কবিদের অনেকেই এঁদের প্রভাব উপেক্ষা করতে পারেননি।

এবারে ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু নিদর্শনের পালা। তবে এটাও আগে বলে নিতে হয় যে উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প ছাড়া যে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় না এ-সত্যটি আধুনিক কবিদের অবশ্যই জানা ছিল। এটা ভারতীয় আলংকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশও বটে। তাঁরা অলংকারকে 'কাব্যদেহের সাজসজ্জা' বলেছিলেন। 'রীতি'-কে বলেছিলেন 'কাব্যের অবয়ব-সংস্থান'। অর্থাৎ যেখানে যে যে উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প সুপ্রযুক্ত সেখানে তার যথাযথ প্রয়োগই 'রীতি' বা স্টাইল। এই স্টাইল বা রীতির বিশিষ্ট প্রয়োগের ভিত্তিতেই এক-একজন কবির পৃথক সত্তা গড়ে ওঠে। 'উপমা কালিদাসস্য' কথাটির তাৎপর্য এই যে, উপমা প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগের মধ্য দিয়েই কালিদাস সমসাময়িকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

কাব্য আধুনিকতায় পা দেয় যখন নতুন বিষয়ের পাশাপাশি নতুন 'কাব্যভাষারও' সৃষ্টি হয়। এই 'কাব্যভাষা' শব্দটির ওপর জোর দিতে হবে। সমকালীন বিষয় কবিতায় আধুনিকতা আনে না, যতক্ষণ-না তাকে নতুন কাব্যভাষায় নতুন ধরনের উপমা বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে
ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল—

জীবনানন্দের অতিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতার এই উদ্ধৃতি আপাদমস্তক আধুনিক। 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে'-র মতো অসাধারণ আধুনিক উপমা বাঙালি পাঠকের আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি, এর আগে রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতায় 'সন্ধ্যার' উপমা আচ্ছন্ন ছিল— "নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা হাতে দীপশিখা।" জীবনানন্দ উপমার খোলনলচে পালটে দিলেন। এর চেয়েও উপমা যেন আরও একধাপ এগিয়ে যায় যখন পাঠকের চোখে পড়ে— "পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" পাখির নীড় যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক, বনলতা সেনের চোখ দুটিও যেন তা-ই। আধুনিক কবিতার অনুরাগী পাঠকমাত্রেরই জানা যে উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প যা-ই হোক-না কেন, এ-সবের ব্যবহারে জীবনানন্দের স্থান পুরোভাগে। এখনও পর্যন্ত এই জাতীয় উপমা বা চিত্রকল্পের বিকল্পের জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি—

ক) *খেলার বলের মতো তাদের হৃদয় এই জানিয়াছে।*
খ) *আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।*
গ) *মাইল মাইল সুপুরিবন আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।*
ঘ) *যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা।*

সবাই জীবনানন্দ নন, হবার কথাও নয়। কিন্তু কাব্যভাষা পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ফর্মেরও যে-ভাঙাচোরা চলছিল তা ক্রমশই স্পষ্টতর হতে থাকে। নতুন নতুন চিত্রকল্প ব্যবহারের ঝোঁকও দেখা যায়। 'ধ্রুপদী' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ-জাতীয় রোম্যান্টিক চিত্রকল্পের অনায়াস-ব্যবহার করেন—

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী,
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণি জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।

কিংবা রোম্যান্টিক বুদ্ধদেবের ইলিশ প্রসঙ্গে "জলের উজ্জ্বল শস্য" অথবা "আমি জানি কিছুই থাকে না/সকলি শুকায়ে যায়, সবই যেন সাবানের ফেনা"— এতদিনের পরিচিত কাব্যভাষা থেকে আলাদা।

নাগরিক জীবনের কিংবা সমকালীন সমাজ-সভ্যতার বিষণ্ণ ধূসরতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আলাদা চিত্রকল্প ব্যবহৃত হচ্ছিল। এ-ব্যাপারে পরিণত বয়সের জীবনানন্দ, সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরা আলাদা ঘরানার। ইতিমধ্যে সময়ও দ্রুত পালটাচ্ছিল। ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম— কোনো কিছুই কবিদের দৃষ্টি এড়ায়নি, অনেক ক্ষেত্রে কবিরা নিজেই এই সমস্ত আন্দোলনে বিশ্বাসী অথবা এর অংশীদার। এই পর্বেই কবিতার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। একদিকে হতাশা ও অবক্ষয়ী চেতনা, অপরদিকে বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয় কবিতার ভাষাকেই কেবল পালটায়নি, রূপকল্প বা চিত্রকল্পও আমূল পালটে দিয়েছে। পরিবর্তিত মনোভাব প্রকাশের জন্যই এই আমূল পরিবর্তন।

'বনলতা সেন'-এর জীবনানন্দই প্রথম আধুনিক নাগরিক সভ্যতার 'অদ্ভুত আঁধার'টি লক্ষ করেছিলেন। 'নগরীর রাত্রি' যে তার এতকালের পরিচিত রোম্যান্টিকতা হারিয়েছে সেটা দেখতেও তিনি ভোলেননি— নগরীর মহৎ রাত্রিকে তাঁর মনে হয় "লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।/তবুও মানুষগুলো অনুপূর্ব— অতিবৈতনিক/বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।" গ্রাম, নগর সর্বত্র যে 'অদ্ভুত আঁধার' জীবনানন্দের দৃষ্টিগোচর, নাগরিক সভ্যতার নৈরাজ্য যাকে জঙ্গলের চিত্রকল্পের সাদৃশ্য এনে দিয়েছে সেই শহরেরই বিশেষণ প্রসঙ্গে 'ধূসর' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন সমর সেন—

কালীঘাট ব্রিজের ওপর লম্পটের পদধ্বনি
শুনতে কি পাও
হে শহর, হে ধূসর শহর।

এই 'ধূসর শহর' রূপকল্পটি টি. এস. এলিয়টের 'unreal city'-র প্রতিফলন বলেই মনে হবে। বস্তুত নাগরিক চিত্রকল্প বা রূপকল্প প্রয়োগে সমর সেনকে আলাদা গুরুত্ব দিতেই হবে। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি এ-ব্যাপারে প্রায় অদ্বিতীয়—

ক. *মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন*
তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি।

খ. *তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে*
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন মেয়েরা আসে।

তবে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চেতনা যে কাব্যভাবনাকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে, সমর সেন সহ অনেকের লেখাতেই তার নিদর্শন পাওয়া যাবে—

ক. *বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন,*
জোসেফ স্তালিন। (সমর সেন)

খ. *হাওড়া-ব্রিজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সূর্য*
প্রকাণ্ড গুলিখাওয়া মানুষের মত।
(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

গ. *ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,*
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।
(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

ইচ্ছে করেই যাঁর নাম এখনও আড়ালে রাখা হয়েছে তিনি একাধারে নাগরিক ও রাজনৈতিক কবি। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সমকালীন কবিতার ভাষা, রূপকল্প সব কিছুই একের পর এক তিনি পালটে দিয়েছেন।

ক. *এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়*
পড়েছে ভেঙে
পাহাড়ের গায়ে সারি সারি সব
চিমনি চুড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া করে কান কাস্তের শান
শুনছে নাকি

কামারশালে?

খ. *দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে*
সাতটি রঙের
ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।

সুভাষের কবিতা থেকে এমন অজস্র উদাহরণ তোলা যায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি আলোচনা আধুনিক কবিতা পাঠকের কাছে বেশ কৌতূহলজনক মনে হবে। সেটা হচ্ছে 'চাঁদ'-এর উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। "চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো'— এইসব রাবীন্দ্রিক চিত্রকল্পের দিন বাংলা কাব্য থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিল। তার বদলে ক্রমশ পাওয়া গেল চাঁদের এইরকম উপমা—

ক. *বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে*
(জীবনানন্দ)

খ. *তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায়*
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

গ. *এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে* (দিনেশ দাশ)

ঘ. *পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি*
(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

তার মানে আবার এটাও নয় যে সমকালে বাংলায় কবিতার উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প থেকে রোম্যান্টিকতা একেবারে বিদায় নিয়েছে। এমন-কি বামপন্থী বলে অতিপরিচিত অনেক কবির কবিতাতেই 'রোম্যান্টিক ইমেজারি'-র ব্যবহার চোখে পড়বে। তবে কোনো কবিকে বামপন্থী বা অবামপন্থী বলে চিহ্নিত করা হাস্যকর। তাঁর মূল্যায়ন হবে সৃষ্টিক্ষমতা দিয়ে। আবার রোম্যান্টিকতা বাদ দিয়ে প্রত্যেক কবিরই সৃষ্টি অসম্পূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরিরাও 'রোম্যান্টিক ইমেজারি'-কে উপেক্ষা করতে পারেননি। এ-ক্ষেত্রে তথাকথিত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কবিদের মধ্যে পার্থক্য নেই—

ক. *মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর ওই পোড়ো বাড়িটার*
ভাঙা দরোজাটা মেলাবেন। (অমিয় চক্রবর্তী)

খ. *একদা এমনি বাদল শেষের হাওয়া*
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে।
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

গ. *চাইলে তুমি বিনা শান্তিও,*
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই,
কৃষ্ণচূড়া রাঙে সে-ও তো হাহাকার
আমারি হৃদয়ের কান্তিও। (বিষ্ণু দে)

ঘ. *হে রাজকন্যে*
এ জনারণ্যে
তোমার জন্যে নেইকো ঠাঁই। (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

ঙ. *চমকে উঠি— আরে!*
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে।
(অশোকবিজয় রাহা)

চ. *অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।*
(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

অথবা, অধুনা বিস্মৃত কবি অরুণকুমার সরকারের একটি অনবদ্য চিত্রকল্প রচনা—

সিন্দুক নেই, স্বর্ণ আনি নি
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য,
ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য।

এবং ঘুরেফিরে আবার সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কারণ, বর্তমান লেখকের মতে জীবনানন্দের পরে নতুন কাব্যভাষা ও রূপকল্প প্রয়োগে তিনিই অগ্রগণ্য—

জলায় এবার ভালো ধান হবে,
লণ্ঠন হাতে অন্ধকারটা নাচাতে নাচাতে
এ বাড়ির ছোটবউ এইসব ভাবছিল।

পরবর্তী পর্বের কবিদের কাছে যাবার আগে সম্ভবত এমন একজন কবির পাতা ওলটানো বাঞ্ছনীয় যিনি বয়সে প্রবীণ হয়েও কাব্যভাষা বা উপমা প্রয়োগে অনেক আধুনিক। তিনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 'সন্ধ্যা'-র অতিপরিচিত উপমাগুলিকে অস্বীকার করে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন— "রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙীন বারাঙ্গনা।"

আর রবীন্দ্র-ঘরানার প্রচলিত রোম্যান্টিক কবিধর্মকে উপহাস করে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন—

তব জয় জয়, চারিদিকে কয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমারে কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ।
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে?।

শেষের দুটি লাইন একদা কল্লোলীয়দের মুখে মুখে ফিরত।

দশকের পর দশক পরিবর্তিত হয়, কবিতার চেহারাও পালটাতে থাকে। আগেই বলেছি, সময় যে কেবল নতুন বিষয়ের জন্ম দেয় তা-ই নয়, তা প্রকাশের নতুন আঙ্গিকেরও সৃষ্টি করে। তাই চল্লিশের দশকের বিদায়ের পর কবিতা যখন পঞ্চাশের দশকে পা দেয়, তখন নতুন কালকে তুলে ধরবার জন্য কবিদের নতুন নতুন উপমা বা চিত্রকল্পেরও সৃষ্টি করতে হয়—

ক. *মায়ের চোখে বাপের চোখে দু'তিনটি গঙ্গা।*
(শঙ্খ ঘোষ)

খ. *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।* (শঙ্খ ঘোষ)

গ. *বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস*
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে।
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

ঘ. *পায়ের নীচে শুকনো বালি, মাটি খুঁড়লে জল,*
গভীরে যাও, গভীরে যাও বুকের হলাহল।
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

পঞ্চাশের দশক এবং কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর এই তিন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির রচনার এই সামান্য নিদর্শন প্রমাণ করে যে কবিতার দিন পালটে গেছে। এঁরা কেউ পুরনো ধাঁচের বাক্যবন্ধ বা চিত্রকল্প ব্যবহার করেননি, নিজেদের আলাদাভাবে তৈরি করে নিয়েছেন। যাঁরা রাজনৈতিক কবি হিসেবে পরিচিত তাঁরাও এ-ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। অর্থাৎ কবিতার কাঠামোটারই ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। উদাহরণের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ানো যেতে পারে—

ক. *ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে।*
ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি রাত থাকতে ওঠে।
শুকতারাটি ছাদের ধারে চাঁদ থামে তালগাছে,
ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ছাড়াকাপড় কাচে।
(জয় গোস্বামী)

খ. *সব রক্ত আর জল মিলে মিশে প্রণামের মত*
রক্তিম ভোরের দিকে যাবে।
আজ নয়, কালও নয়, তবু জেনো একদিন হবে।
(অমিতাভ দাশগুপ্ত)

অথবা

গ. *হৃদয় যতটা বামে আমি তার চেয়ে বেশি বামপন্থী নই।* (অমিতাভ দাশগুপ্ত)

আবার একই সময়ের কবি তরুণ সান্যালের ব্যবহৃত একটি চমৎকার চিত্রকল্প একদা আমাদের চমৎকৃত করেছিল— "হাওয়ায় ধুলোর গন্ধ, ধুলোয় সূর্যের রক্ত, রক্তমাখা করুণ কান্নায়।"

ষাটের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা যে একাধারে কবিতার প্যাটার্ন ও চিত্রকল্প পালটে দিয়েছিলেন, এ-সময়ের অন্যতম শক্তিশালী কবির একটি স্তবকই তার অনবদ্য নিদর্শন—

দশটি আঙুলে আমি দশটি উদ্যান ধরে আছি,
কখন নখাগ্র হল গণ্ডারের খড়্গ
ধূর্ত সাপের বিষদাঁত
আমিই জানি না। (পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

আবার একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক কবিতায় কবিকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি পঙ্‌ক্তিকে চিত্রকল্প প্রয়োগের কাজে লাগাতে দেখা যায়—

উনুন জ্বলেনি আজ
ছিটের বেড়ার গায়ে ডানপিটের তেজি রক্তধারা
গোধূলি গগন মেঘে ঢেকেছিল তারা।
(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

অথবা, নবারুণ ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি— "এই বধ্যভূমি আমার স্বদেশ নয়"— কাব্যরূপ ও উপমার সব ধারণাই পালটে দেয়। আবার পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি পঙ্‌ক্তি হঠাৎই ভিতরটা নাড়িয়ে দেয়— "ভীষণ বৃষ্টির শব্দ সারাদিন স্মৃতির ভিতরে।"

এভাবেই কবিতা যত এগিয়ে চলে নতুন থেকে নতুনতর উপমা বা চিত্রকল্প তাতে সংযোজিত হতে থাকে। একদা পাঠককে চমকিত-করা তুলনাগুলি ক্রমশ যেন ম্লান হয়ে যায়। এরই মধ্যে রমানাথ ভট্টাচার্যের মতো প্রবীণ কবি হঠাৎই হয়তো এই ধরনের চমকিত করবার মতো একটি পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেন— "প্রস্ফুটিত জবা যেন চেলি পরা পরী।" তবে ধীরে ধীরে নতুন কালের পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। আর নতুনতর রূপকল্পের জন্য পাঠকেরা অপেক্ষা করতে থাকে। ❑

JOURNAL
OF THE
ROYAL ASIATIC SOCIETY
1920
PART I. – JANUARY

To the East of Samatata

(ON THE SIX COUNTRIES MENTIONED BUT NOT VISITED BY YUAN CHWANG)

BY PROFESSOR PADMANATH BHATTACHARYA, VIDYAVINOD, M.A.

THE famous Chinese traveller Yuan Chwang travelled throughout India during the second quarter of the seventh century A.D.; he proceeded eastwards as far as Samatata, and when he was turning back he mentioned six countries which he had heard of but could not visit. Their names are given in serial order : "(1) Shihli-Ch'atalo to the north-east (from Samatata) among the hills near the sea ; (2) south-east from this, on a bay of the sea, Kamolangka ; (3) Tolopoti to the east of the preceding ; (4) east from Tolopoti to the east of the preceding ; (4) east from Tolopoti was Ishangnapulo ; (5) to the east of this was Mohachanp'o ; and (6) to the south-east of this was the Yenmonachou country."[1]

Regarding the location and identification of these countries antiquarians, European and Asiatic, like M. Chavannes and Dr. Takakusu, have given their opinions, and the consensus of these learned views has led to the following identifications :-

(1) Shih-li-ch'a-to-lo was Prome in Lower Burma, the ancient Tharekhettara or Srikshetra ; (2) Ka-mo-lang-ka was Pegu and Delta of the Irawadi ; (3) To-lo-po-ti is the same as Dwaravati, "the Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya, the ancient capital of Siam" ; (4) I-shang-na-pu-lo, i.e. Ishanapura, was Cambodia ; (5) Mo-ha-chan-p'o or Mahachampa was modern Cochin-China with a part of Anam ; and (6) the Yen-mo-na-chou was Yamunadwipa, which might be Java but has not been yet identified.[2]

The late Mr. Watters, who, according to Dr. Rhys Davids, was the most qualified person to write an authentic work on the interpretation of Yuan

[1] Watters' *Yuan Chwang*, Vol. ii, pp. 187-8. Watters' work has been followed in this article as he is the most reliable authority.

[2] For details *vide* Watters' *Yuan Chwang*, vol. ii, pp. 188-9.

Chwang's valuable records,[1] objects to Shih-li-ch'a-ta-lo being identified with Prome or Tharekhettara, on the grounds that it was far from the sea and that it lay *south-east* of Samatata, instead of *north-east*, which is the reading of all the texts of the Life and of the Fang Chih.[2] Having thus criticized the view already established, Watters has given his own idea, viz. that Shih-li-ch'a-ta-lo or Srikshetra "should correspond roughly to the Tipparah District";[3] and this has been confirmed by Dr. Vincent A. Smith in his notes appended to Watters' volumes.[4]

Before proceeding to examine these opinions we must ascertain the position of Samatata. It is stated in the narrative that the Chinese traveller proceeded from Kamarupa southwards, and after a journey of 1,200 or 1,300 li (6 li = 1 mile) reached the country of Samatata, and that this country was on the seaside and was low and moist, and was more than 3,000 li in circuit.[5] Then, again, from Samatata the pilgrim journeyed west for over 900 li and reached Tanmolihti,[6] which was decidedly Tamralipta, the modern Tamluk in the Midnapur District. Samatata, therefore, must have been the south-eastern part of the Bengal Presidency corresponding to the Dacca, Faridpur, Backerganj, Jessore, and Khulna Districts ; and this is the locality shown as Samatata in the map appended to Watters' volumes by Dr. V. A. Smith.

Having thus fixed with fair certainty the location of Samatata, let us now examine the position and identification of the six countries one by one.

(1) The first is Shih-li-ch'a-to-lo. We learn three points about it, viz. : (1) it was north-east of Samatata; (2) it was among the hills; and (3) it was near the sea. Those who so long localized it about Prome in Lower Burma overlooked the first and the third points, and have thus been rightly criticized by Watters, as stated already. They had also missed another, a very important, fact : A.D. 95 was the date of the demise of the last king of Prome, and Tharekhettara and the kingdom fell immediately after.[7]

Was it possible that Yuan Chwang, coming about five centuries and a half after the extinction of the kingdom of Tharekhettara, would be informed of its existence? We may, therefore, say conclusively that Yuan Chwang did not mean Tharekhettara of Prome when he spoke of Shih-li-ch'a-to-lo.

Let us now come to what Watters has put forward as to Shih-li-ch'a-to-lo. Unfortunately he has not stated his arguments in favour of it : apparently he only looked at the map and found the Tipperah District fairly on the north-east, and so he made a surmise. Had he only looked a little up exactly north-east of what was Samatata, he would have found the right claimant in the district of Sylhet, which in the vernacular is called Srihatta. We have said elsewhere that "what the people whom Yuan Chwang consulted said was 'Srihatta', which the pilgrim heard as 'Srikshatra', and represented in his defective Chinese tongue as Shih-li-ch'a-to-lo".[8]

The peculiar way in which the Assamese pronounce the letter হ (*h*) even now (one hears it sounded like the Greek letter Χ (*chi*)) indicates probably the manner in which in this part of East Bengal close to Assam the letter was pronounced in old days, and the Chinese pilgrim might not be wholly to blame for taking Srihatta as Srikshatra.[9]

[1] *Vide* Preface to Watters' *Yuan Chwang*, vol. i, p. v.

[2] Watters' *Yuan Chwang*, vol. ii, pp. 188-9.

[3] Ibid., p. 189

[4] Ibid., p. 340.

[5] Ibid., p. 187.

[6] Ibid., p. 189.

[7] Lieut.-General Sir Arthur P. Phayre's *History of Burma*, ed. 1884, p. 18.

[8] *Epigraphia Indica*, vol. xii, pt. ii, No. 13, p. 67. The point whether Srihatta (Sylhet) existed as a distinct kingdom in Yuan Chwang's time has been dealt with in that article as a side issue, and so has not been touched on here.

[9] A Pandit once said that he had come across Srikshetra written in a Tantra in place of Srihatta : if this be a fact all confusion is cleared up. [Srihatta means "Market of Sri or Lakshmi", the deity presiding over the Pitha of Sylhet being Mahalakshmi ; and Srikshetra means "field or place of Sri (Lakshmi)" ; so both these words are almost of the same signification.]

We will now see if Sylhet (Srihatta) fulfils all the conditions. It was "north-east of Samatata" (Sout-Eastern Bengal) ; "it was among the hills" : a reference to the map of Sylhet will show that it is surrounded by ranges of hills on all sides except the west. But a map of modern Sylhet would not show that it fulfilled the third condition, as the district is not at present "near the sea." This requires some explanation.

The district of Sylhet, which, by the way, included two centuries ago the eastern part of Mymensingh and the northern part of Tipperah, contains many marshes that go by the name Haor, which apparently is a corruption of the word Sagara, as it is changed into Sayar in colloquial Bengali and the initial *S* is commonly changed into *h* in the Sylhet patois.[1] These "haors" are gradually being silted up, and are now being utilized in paddy cultivation, even villages are growing admist them near river banks or at spots raised up by earthquakes. Only 140 years ago, in 1778, when a certain Mr. Lindsay went from Dacca to Sylhet as its governor, he wrote : "I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet I had recourse to my compass, the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent."[2] If this was the state of things less than a century and a half ago, what the condition of the district was about thirteen centuries ago may well be imagined. In fact, one of the two copper-plates discovered near Bhatera in South Sylhet about forty years ago, which, according to Rajendralala Mitra, were executed in the fourteen century A.D. (but which might belong to an anterior date though certainly not prior to the tenth century A.D.), contains in it the word সাগর-পশ্চিমে (*sagara-paschime*, "west of the sea") as the boundary of a plot of arable land.[3] In the other plate also there is the word নৌৱাটক (*nau-vataka*), which Rajendralala Mitra has translated as "war boats" mentioned in two places in connexion with the description of the royal donor's war materials.[4] This also indicates the existence of something like the sea near by even some centuries after the Chinese traveller visited India.[5]

Before concluding the case of Shih-li-ch'a-to-lo we have to deal wih a third claimant, as some people would identify it with Chittagong, the Sanskritized name whereof is Chattala, by prefixing the honorific syllable Sri before the latter. There are serious objections to this theory : firstly, in that case south-east is required to be substituted for north-east (of Samatata), which is quite unwarranted, as already stated. Secondly, the name Chattala occurs in the Tantras which are quite modern works, and is apparently the Sanskritization of Chatigaon, which, according to Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C.I.E., the antiquarian, who was a resident of Chittagong, was the name by which the place was known in the Buddhistic world even in the ninth century A.D.[6] ; and thirdly, even if the name Chattala was known in Yuan Chwang's time, there does not seem to be any reason why the Chinese traveller should take the pains of prefixing Sri to it, which, by

[1] *Vide* Dr. Grierson's *Linguistic Survey of India*, vol. v. pt. i, p. 224.

[2] Extracts from *The Lives of Lindsays*. Appendix to Hunter's *Statistical Accounts of Assam*, vol. ii, p. 346.

[3] *Vide* line 38 of the Copper-plate Inscriptions No. 1, as published with the *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal* for August, 1880.

[4] *Vide* lines 13 and 21 of the copper-plate Inscriptions No. 2 in the same Proceedings. That these copper-plate grants related to Sylhet (Srihatta) is evident from the fact that the donors were described as belonging to a dynasty which ruled the kingdom of Srihatta and that one of these grants related to Srihattanatha Siva.

[5] That the whole of the plain portion of the district formed part of the ocean at a remote period will be apparent from the fact that the lofty mountains to the north and east rise abruptly; the conformation of some of the sandy hillocks on and above the town of Sylhet, and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary, also prove this (*vide* Hunter's Statistical Accounts of Assam, vol. ii, p. 263, and Hamilton's *East India Gazetteer*, vol. ii, p. 352).

[6] *Vide* p. 6 of a vernacular work, Chattagramer Vivarani, issued in instalments from Chittagong.

the way, is not found even in the Tantras. Shihlich'atalo therefore is Srihatta (Sylhet) and no other place.[1]

2. Ka-mo-lang-ka, the next country in order, lay south-east of Shih-li-ch'a-to-lo on a "bay of the sea". It is regrettable that Watters, who protested against Shih-li-Ch'a-to-lo being Prome, acquiesced in Kamolangka being Pegu and the Delta of the Irawadi, as decided by some anterior antiquarians. If, as Watters says, Shih-li-ch'a-to-lo be the Tipperah district, how could the next country, said to have been lying south-east thereof, apparently in close propinquity, be one far away from the former and separated by insurmountable mountain ranges? Nowhere in the history of Burma do we come across a name that sounds like Kamolangka. Moreover, the country that included the Delta of the Irawadi was known as Subarnabhumi[2] in ancient times, and the city of Pegu, built in the sixth century A.D., was given the classic name of Hansawadi.[3] Yuan Chwang coming within half a century after the foundation of that city, would have mentioned the classical name if he really meant to refer thereto.

Where, then, was Kamolangka? It was where it should have been, viz. a territory south-east of Shih-li-ch'a-to-lo (Srihatta or Sylhet), where still a faint recollection of it is left in the name of Comilla, the headquarters station of the Tipperah district. If we should consult a modern map we might find Tipperah more south-west than south-east of Sylhet; but, as I have already mentioned, Sylhet, even in the eighteenth century A.D., comprised the eastern part of Mymensing and the northern part of Tipperah, and as it was mentioned as north-east of Samatata, in contiguity of course, who knows but that its western boundary was further westwards 1,300 years ago? At present the district of Tipperah is not on a bay of the "sea", but what has been stated of Sylhet, which is further inland than Tipperah, might with greater possibility be said of the latter ; the Brahmaputra has its old channel terminated at a point which was then on the north-western houndary of the old Tipperah, and possibly this was then the head of an estuary that looked like a bay. Only a few years ago, when on account of a sudden flood all cultivation in the plain portions of the district was destroyed, the vast sheet of water presented the appearance of a sea, and this was surely the ordinary condition 1,300 years before.[4]

Five miles from Comilla (already mentioned) there is a hill called Lalmai but popularly known as Mayanamati Hill, called after the heroine of a story contained in the old manuscript books named Mayanamati's Gan (songs of Mayanamati) ; one of

[1] Itsing, who came to visit India about thirty years after Yuan Chwang, said, apparently referring to this place : "Going east from the Nalanda Monstery, 500 *yojanas*, all the country is called the Eastern Frontier. At the (eastern) extremity there is the so-called 'Great Black Mountain', which is, I think, on the southern boundary of Tu-fan (Tibet). This mountain is said to be on the south-west of Shu-chuan (Su-chuan) from which one can reach this mountain after a journey of a month or so. Southward from this, and close to the sea coast, there is a country called 'Srikshatra (Prome)'" (p. 9, Dr. Takakusu's *Itsing* ; words within parenthesis are those of Dr. Takakusu). Whatever the learned editor (Dr. Takakusu) might say (and such views have already been criticized) this 'Srikshatra' was 'Srihatta' or 'Sylhet' ; the 'Great Black mountains' must have been the Bhotan range that skirts Tibet ; and this Chinese pilgrim making his way through the Brahmaputra Valley and the Khasi hills reached Srihatta, that, as already stated in detail, had then a vast sheet of water near by that passed for a "sea". Itsing, who had, of course, studied Yuan Chwang's Itinerary, was probably eager to see Srihatta, which his predecessor could not visit, and benefiting by the latter's experience, he did not go via Samatata for fear of the "sea" which would intervene on that way, but took a rather circuitous route and so reached the place as stated above.

[2] Phayre's *History of Burma*, p. 19.

[3] Ibid., pp. 29-30.

[4] In what season Yuan Chwang came to Samatata and turned back from that place is not known. We can presume, however, that he must have been here during the rainy season, when casting his eye towards the north-east he could see nothing but a vast sheet of water that discouraged him proceeding further that way. This is quite possible, as the Buddhist monks observed the rainy season as a period of retreat (*vide* Watters' *Yuan Chwang*, vol. i, pp. 114-5). Yuan Chwang might have passed such a period in Samatata.

such books has recently been published by the Dacca Sahitya Parishat in which we find the following lines:-

বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌরর শহর।
দাদার মিরাশ (এড়ি) যাবেক কামলাক নগর।।

Baper mirash edi yaimu Gaurar Shahar
Dadar mirash (eri) yavek Kamalak nagar.[1]

This Kamalak is apparently a corruption of Kamalanka, the whilom state that included Comilla.

Information about an extinct kingdom named Karmanta is available from two copper-plate inscriptions, one of which was published by Dr. Rajendralala Mitra in the Journal of the Asiatic Society of Bengal in 1885.[2] These plates were discovered at Ashrafpur, near Narayanganj, close to the south-western boundary of Tipperah. Twelve miles west of Comilla there is a village called Barkamta (Great Kamta), wherein ruins of buildings as well as of stone statues have been discovered ; and on the pedestal of one of these statues (of Narteswara) has been discovered an inscription containing the name of a king of Karmanta.[3] This Barkamta being still popularly known as the capital of an ancient kingdom, lying near Comilla, we cannot help inferring the identity of these two kingdoms, Kamalanka and Karmanta (Kamta), which sound much alike, as do Udra and Utkala of Orissa. Kamalanka alias Karmanta must have existed in the seventh century as a kingdom deserving of notice by Yuan Chwang ; the copper-plates inscriptions have been ascribed to eighth century A.D., and it is not too much to assume that the dynasty to which the donors belonged certainly had existed from an anterior date, at least a century earlier, as the copper-plate inscriptions contain the names of the royal donors' ancestors.

So 'Kamolangka' cannot be Pegu or any other place than the locality now known as Tipperah, as after the overthrow of the ancient kingdom a large portion of it was occupied by the kings of Hill Tipperah,[4] although it was afterwards conquered by the Muhammadans.

3. To-lo-po-ti, the next country in order, lay east of Kamolangka. This has been interpreted to represent in Sanskrit Dwaravati, which was "the Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya, the ancient capital of Siam."[5] Here is another instance of anachronism that has been overlooked by the antiquarians who would locate everything in the Indo-Chinese Peninsula. "It is stated in the History of Siam that King Phra Ramathebodi founded the capital Ayuthia in A.D. 1350,"[6] i.e. more than 700 years after Yuan Chwang had visited India. There are other places in the Indo-Chinese Peninsula called Dwaravati, but they were not east of Pegu and the Delta of Irawadi, identified as Kamolangka as noticed before.

[1] p. 6, col. i of the Publication of the Dacca Sahitya Parishat. The meaning of the lines is : "I shall go to the town of Gaura (=Gauda) after leaving my father's estate and to the town of Kamalak (leaving) the brother's estate." It should be noted here that both Watters and Beal have rendered Kamolangka as Kamalanka, and the word Kamalak here seems to support this ; but Kamalanka is the form that gives a better meaning, and in fact the one adopted by the Indian writers inclusive of those who would identify it with Pegu.

[2] Pp. 49-52 of the *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*. The other was published in the same journal in 1890-1.

[3] *A Forgotten Kingdom of Eastern Bengal*, by Mr. N. K. Bhattasali, in the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. x, No. 3, March, 1914, vide pp. 85-91.

[4] A part of it became annexed to the other neighbouring kingdom of Samatata when the latter was under the Pala dynasty, as will be inferred from an inscription containing the name of Mahipala I upon the pedestal of a statue of Vishnu, found at Baghaura in Tipperah (*vide* pl. x, facing p. 18, vol. xi, No. 1, 1915, of the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*).

[5] *Vide* Watters' *Yuan Chwang*, vol. ii, pp. 189.

[6] *Vide* Browning's *Siam*, vol. i, p. 43 (quoted in Phayre's *History of Burma*, p. 66, n.).

In fact, as Kamolangka was not Pegu, so Tolopoti was not Dwaravati, or at any rate in Siam[1] or any other place thereabouts. We have only to look east of the modern British district of Tipperah to find out what the Chinese pilgrim really meant by Tolopoti, viz. the State of Hill Tipperah. Probably Tolopoti is a contracted Chinese representation of Tripurapati. Watters remarks, however, that "the characters seem to stand for Talapati, that is, Mahadeva[2] (*l* = *r*), and also that Talapati is the city with that name to which Shan Tsai went in order to consult Mahadeva its patron God."[3] In that case the state of Hill Tipperah has the strongest claim for consideration, the name of Tipperah occurs in the enumeration of Pithas (sacred places where limbs of Sati, the consort of Mahadeva, fell) ; the Sakti (female deity) here is called Tripura, and the Bhairava (Mahadeva presiding over the same) as Tripuresa, which may be paraphrased as Tripurapati. The capital of the state has shifted from place to place with different names, almost once in each century, according to the variation of its boundaries ; and it is quite probable that its capital 1,300 years ago might have been a city bearing the name of Tarapati or even Dwaravati.[4] That Mahadeva was in those days and even long before that time the "patron God" of the state can be easily inferred. The remains of a colossal statue of Mahadeva may be seen on a peak near Kailasahar, the headquarters of a subdivision of the state ; and the statue, though very much damaged, is indicative of a very remote antiquity. It is also stated in the Rajamala (genealogy of the Tipperah kings) that when at the death of Tripura the line became extinct, the queen became pregnant by the worship of the Lingam.[5] This Tripura, who is said to have given his name to the state, was, according to the Rajamala, a contemporary of Yudhishthira, one of the chief heroes of the Mahabharata.

That the state was a noteworthy one in Yuan Chwang's time will be evident from the fact that there is an era of the Tipperah state that dates from 590 A.D., about which[6] Sir W. W. Hunter writes in the statistical account of Hill Tipperah (p. 470) : "The state of Hill Tipperah has a chronological era peculiar to itself. The Dewan reports that it was adopted by Raja Biraraja, from whom the present Raja is ninety-second in descent. Raja Biraraja is said to have extended his conquest across the Ganges, and in commemoration of that event to have established a new era dating from his victory." This was about half a century before Yuan Chwang took note of that kingdom as Tolopoti.[7]

(4) I-shang-na-pu-lo is mentioned next as lying east of Tolopoti. It has been long identified with Cambodia, Tolopoti having been looked upon as Siam. But the case of Siam has already been dealt with : it could not be Tolopoti, as it had the name of Champa. An antiquarian (Professor Chavannes)

[1] Ancient name of Siam was Champa, vide p. 8, of Colonel L. W. Shakespear's *History of Upper Assam, Upper Burma, and N.E. Frontier*. Mr Taw Sein Ko, of the Archaeological Department, also considers Siam as Champa (vide *Northern Burma Gazetteer*, vol. i, pt. i, p. 205).

[2] Watters' *Yuan Chwang*, vol. ii, p. 189.

[3] Ibid.

[4] The state of Tipperah had other names also : for instance, the Burmese called it Thuratun in their chronicle called Maharajaweng. We may here hazard a conjecture that it might have once had the name or surname of Sthalavati (whereof Tolopati was the form in Yuan Chwang's writing) to distinguish it from Srihatta and Kamalanka near by, which were aqueous regions, Sthalavati meaning 'consisting only of Sthala (terra firma)'.

[5] শিৰলিঙ্গনতা ধ্যানাত্ সা বভূৱ সুগৰ্ভিণী "Sivalinganata dhyanat sa babhuva Sugarbhini" (Skt. Rajamala).

[6] Vide also Sir Roper Lethbridge's *The Golden Book of India*, p. 541.

[7] In the Allahabad pillar inscriptions of Samudra Gupta (Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. vol. iii, pp. 1-17) there occurs a word সমতট ডৱাক কামৰূপ নেপালকত্ত্ৃপুরাদি "Samatata Davaka Kamarupa Nepalakattripuradi". In this document of fourth century A.D. an eminent Bengali writer on the history of Tipperah finds mention of the name of the state, as instead of Nepala Karttripuradi (as is the reading generally accepted) he would read Nepalaka Tripuradi (তৃ=ত্রি). This is mentioned here for what it is worth.

identifies I-shang-na-pu-lo with Cambodia on the ground that a little before Yuan Chwang's time a king named Ishana ruled over Cambodia[1]; but the learned professor does not state if the said king founded any capital bearing his own name, as formerly a kingdom might also be named after its capital, but seldom by the personal name of its ruler.[2]

Let us now see if we can find any trace of Ishangnapulo in the direction indicated by us, i.e. on the east of Tripura (Hill Tipperah). But before doing so we must state here that in those days the state of Tipperah included the southern and eastern part of the district of Sylhet and the western and southern part of Cachar. By Ishangnapulo was therefore meant the present state of Manipur, including the eastern part of the Cachar district, which lay to the east of the kingdom of Tolopoti (Hill Tipperah). The name Manipur occurs in the Mahabharata, and the present-day rulers of Manipur believe that they are descendants from Babhruvahana, son of Arjuna, whose exploits are delineated in the said Epic.[3] The indigenous history called Chaitaram Kumbaba contains accounts of the kings of Manipur from the remotest antiquity. Much of these is no doubt of a mythical nature, but they are not the only evidence of antiquity. Those who have visited the Bhuban Peak in the ridge of hills that form the present boundary between Cachar and Manipur, and have seen therein the statues of deities like Mahadeva, Durga, Ganesa, etc., though they are all more or less mutilated, and also the caves that were apparently used as places for meditation, cannot but be impressed with the idea that this was a spot within a territory that had received the light of Hindu civilization at a very remote period of time.[4] In the state of Manipur itself there have been discovered statues of Mahadeva which are certainly indicative of remote antiquity.

On the eastern side of the boundary hills between Cachar and Manipur, at the foot thereof stands Vishnupur, which was formerly the capital of Manipur, and which perhaps is what the Chinese pilgrim meant by Ishangnapulo. Vishnu is easily converted into Vishen ; and in fact in some of the Government maps the place is spelt as Bishenpur (where *B* is the modern varnacular substitute for *V*). The initial letter (*V*), being a semi-vowel, might easily assume an inaudible form. So what was Vishnupur came to be pronounced and heard as Ishenpur, and noted by the Chinese pilgrim as Ishangnapulo.[5] The village of Vishnupur is located in such a manner as to command the view of the whole valley of Manipur, and as such it is a place fit for being the metropolis. There is something very remarkable about this place, for the people there who are called Vishnupuriya speak a language which is akin to the Aryan Bengali

[1] *Vide* footnote 4 to Notes on the Topographical Names (pp. li-lii of Dr. Takakusu's *Itsing* (Clarendon Press, 1896).

[2] General Sir A. P. Phayre says about Ishangnapulo as follows :- "Beyond that (Tolopati) state east Tshangnapulo (T = I?) is not recognizable ; but still further east Mohachampa mentioned by the pilgrim represents beyond doubt the ancient kingdom of Cambodia (see paper by James Ferguson in Journal of the Royal Asiatic Society, vol. vi, N.S., 1873)" (*History of Burma*, p. 32). So that Cambodia not only did not come to be considered by him as I-shang-na-pu-lo, but it was regarded as Mahachampa beyond doubt!

[3] *Vide* Aswamedheparvan, chap. 89 et seq.

[4] Careless people might connect this spot with the state of Hill Tipperah ; but stone statues found in East Cachar show almsot exact similarity in workmanship with those found in the Manipur Valley, and this goes a great way to support an assumption that Eastern Cachar and Manipur formed one state of old. Yet it should be stated that it is not quite improbable that this region might have been overrun by the Tipperah kings and even occupied by them for some time, as in the case of Kamalanka already noted.

[5] If M. Chavannes' reason (as already stated) for the name Ishanapur being applied to Cambodia on account of the name of a ruler (Ishana) be accepted as valid, then this very name (Ishanapur) can more appropriately be predicated for this region also. Ishana (= Isana) means Mahadeva and also north-east. This locality, containing the statues of Mahadeva (as that at Bhuban Peak and others in the valley of Manipur), and lying north-east of a famous kingdom (of Samatata), might claim that nomenclature also ; and by a phonetic process, the reverse of what has been stated above, Ishanpur might have been changed into Vishnupur in modern times.

dialect, while the other Manipuris have a non-Aryan tongue.[1] The number of the Vishnupuriyas in Manipur is very small, while the bulk of the Manipuris settled in Cachar and Sylhet style themselves Vishnupuriya. The Manipuris call the Vishnupuriyas Mayang, which literally means "many people" (*mi-iam*), but now signifies "foreigner". The condition of Vishnupur[2] and its people, as well as of the statues of deities of the Bhuban Peak and also in the valley itself, bespeaks the existence of an Aryan kingdom that had existed in ancient times but has almost been swept away by the inroad of the Barbarians, who, however, have become Hinduized and civilized by adopting the ways of the conquered people.[3]

The country of Ishangnapulo mentioned by Yuan Chwang, therefore, was the state of Manipur inclusive of the eastern part of Cachar, the capital whereof was Vishnupur.

5. Mo-ha-chan-p'o, the next country in order, was east of Ishangnapulo. It has hitherto been identified with Cochin-China and part of Anam.[4] The Chinese pilgrim apparently wrote Mahachampa, using Maha (great) as a prefix to distinguish it from Champa in Bihar, which he had already visited.[5] Besides Cochin-China several countries in Further India claimed this name ; the cases of Cambodia and Siam have already been mentioned, and we are going to bring in another claimant which lay close to the east of the country that we have endeavoured to identify with Ishangnapulo, viz. the country in Northern Burma, whereof the capital was Sampenago (= Champanagar), the ruins of which are even now seen near Bhamo, and which was probably the most ancient of all the countries in Further India that claim the name of Champa. Sampenago had an antiquity and a Buddhistic reputation utterly absent from countries like Cochin-China, Cambodia, or Siam, or, in fact, in any other place in the Indo-Chinese peninsula. It is said that Dharmasoka of Magadha built a set of this pagodas, tanks, etc., as the Buddha had lived here in a former existence in the body of a crow.[6] This ancient kingdom existed up to the eleventh century A.D. Sektumin was a very famous king of Sampenago at a very remote period of antiquity, and his successors continued to rule there up to 400 B.E. (=A.D. 1038).[7] This Sampenago was apparently the capital of a Shan State, as Bhamo is stated to have formed an integral part of the Shan kingdom of Pong. This statement is based on the researches of Captain Pemberton, who derived his information from Shan MSS. at Manipur.[8] That this Shan kingdom of Pong was imbued from ancient time with the Buddhistic culture is proved by the test of language : "The Shan language is described by Dr. Cushing as a monosyllabic language, but has many polysyllabic words of Burmese and Pali origin."[9]

Probably this region was colonized in ancient days by people from Champa, and we learn from

[1] *Vide* Dr. Grierson's *Linguistic Survey of India*, vol. v, pt. i, p. 419.

[2] The present writer visited the place in October, 1916, and was told by the people there that the old Vishnupur was situated a little up the hill, and was buried underground by a huge landslip caused by earthquake.

[3] A very old and popular story of Khamba-Thaibi, wherein the hero and the heroine are described as incarnations of Mahadeva and his consort (Durga), shows that the worship of Siva and Sakti was current in the valley– a fact indicative of its antiquity. The scene of the plot is laid at Mairang, a place close to the south of Vishnupur.

[4] Watters' *Yuan Chwang*, vol. ii, p. 189.

[5] *Vide* ibid., p. 181 et seq.

[6] *Vide* extracts of Mr. Ney Elias's "Introductory Sketch of the History of Shans", p. 56, pt. ii, vol. i of the *Gazetteer of Northern Burma and Shan States*.

[7] Ibid., p. 57.

[8] Vide *Bhamo Gazetteer*, p. 13.

[9] Ibid., p. 28. The very word 'Shan' may be a monosyllable contraction of Sanpo or Champa. Mr Ney Elias in his "Introductory Sketch of the History of Shans" mentions a term "Mau Shans" which he says "is a political rather than a racial name" (p. 190), pt. i, vol. i of *N.B. Gazetteer*). May not this Mau Shans be a reminiscence of Maha Champa? Mr. Scott, editor of the *N.B. Gazetteer*, sees the trace of Kausambi in Ko-shan-pye or the nine Shan States (vide pp. 189-90, *N.B. Gazetteer*, pt. i, vol. i). Ko means Nine, and Shampye might represent Champa as well.

General Phayre's *History of Burma*[1] that Kshatriya princes arrived in Burma through Manipur by a route which is still called Mauriya or Maurira, that reminds us of the Mauriya king Asoka of Magadha, to which Champa then belonged.

Thus it was quite natural that in the enumeration of unvisited countries in succession the Chinese traveller looked this way, viz. towards Tipperah (Tolopoti), Manipur (Ishangnapulo), and the Shan State of Champanagara (Sampenago),[2] and not in any other direction.

6. Yen-mo-na-chou, the next and the last country mentioned, lay south-west of Mohachanp'o, and this has not been yet definitely identified, apparently because the antiquarians have hitherto been traversing a wrong region. If we look to the south-west of the locality that had Sampenago (modern Bhamo) in it, we find the province of Burma, which in those days was a powerful kingdom and probably included even Chittagong. Chou means an island, i.e. *dwipa* in Sanskrit ; and Yen-mo-na-chou, which is surmised as Yamunadwipa by Watters,[3] must have been Jambu-dwipa[4] if it bore any meaning at all ; and it appears from the translation of a letter from the Burmese Government to the Governor-General of India, dated October 21, 1879, that the king of Burma was spoken of as "the Burmese Sovereign of the Rising Sun who ruled over the country of Thuna Paranta and the country of Tambudeepa."[5] This Tambudeepa is apparently Jambudwipa, which meant all countries south of Ava.[6] From the way in which the countries of Further India were given Indian names, we should think it quite natural that the ancient sovereigns of Burma should call a portion of that country after the name of India itself, viz. Jambudwipa, a name which was very common in Buddhistic literature.[7] The question arises whether or not the Burmese kingdom was a noteworthy one in the seventh century A.D., and in answer we might say that this was the era-making period of the Burmese, as the Burmese era was founded by King Pupasaw in the year 638 A.D.[8]

As already stated, the Burmese empire then extended probably up to Chittagong, so that by enumerating the country of Yen-mona-chou Yuan Chwang completed a circle. Starting from Shih-li-ch'a-to-lo, north-east of Samatata, he stopped with Yenmonachou lying south-east, and this was more

[1] p. 4 (*vide* quotation later on).

[2] It is interesting in this connexion to note that a prince of the Shan State of Pong chose this route (viz. Tipperah and Manipur) when returning home from a tour of conquest in 777; vide p. 58 of Browne's *Statistical Accounts of Manipur*, and p. 12 of Phayre's *History of Burma*.

[3] *Yuan Chwang*, vol. ii, p. 189. Dr. Takakusu's conjecture is Yavanadwipa, meaning Sumatra (vide the geographical notes to his *Itsing*, pp. li-lii). This is not borne out by a reference to the map.

[4] The word Jambu could be represented by Yenfou in Chinese. So it appears from Watters' *Yuan Chwang*, vol. i, p. 33. In that case Yen-mo-na might also very nearly represent the same word Jambu in its corrupted form in Burmese.

[5] *Northern Burma Gazetteer*, vol. i, pt. i, ch. iii, p.103.

[6] Ibid. [Thuna (=Suna) Paranta represented all the countries north of Ava.]

[7] *Vide* Watters' *Yuan Chwang*, vol. i, p. 132.

[8] *Vide* Appendix (p. 202), *A Chronology of Burma*, by Max and Bertha Ferrars. This chronology will also show the antiquity of Burma. Mr. Taw Sein Ko says in a letter to the present writer that the Burmese era was, according to the native chronicles, inaugurated by Thinga Raza, a king of Pagan, after wiping out 1,182 years of the Era of Religion (Anno Buddhae) reckoned by the Burmese from B.C. 544. About this Pagan the same authority writes : "The native writers aver that Tampadipa (which is a more correct form of Tambudeepa mentioned above) is the name applied to Pagan, which is situated on the left bank of the River Irawady, and that Suna Paranta is applied to a place opposite to Pagan on the right bank of the same river, and they are inclined to ascribe their foundation to the time of the Buddha." Mr. Taw Sein Ko, it seems, has not much faith in his "native chroniclers" ; but that is a matter of opinion. The fact remains (and this is what is required for our purposes) that this part of the Indo-Chinese Peninsula was noteworthy in Yuan Chwang's time, and a prominent part of it bore the name of Tambudeepa (which we have assumed to be a corruption of Jambudwipa), which Yuan Chwang noted as Yen-mona-chou.

probable and natural. It is also quite improbable that leaving aside Srihatta (Sylhet), Kamalanka, etc., which lay near at hand and in close contiguity with Samatata, the Chinese pilgrim should have troubled himself to take note of regions like Prome and Pegu that lay far off from Samatata, between which and those countries there lay the sea, the rivers, and the mountains.[1]

In conclusion, it may be stated that the region with which we have concerned ourselves here is as yet a virgin field for research, and if this our humble writing serves to invite the attention of the veteran antiquarians to work in this field we should think ourselves amply rewarded. ❑

[1] General Phayre, in his *History of Burma*, p. 4, says : "The route by which the Kshatriya princes arrived is indicated in the traditions as being through Manipur, which lies within the Basin of the Irawaddy. The northern part of the Kubo Valley, which is the direct route of Manipur towards Burma, is still called Maurya or Maurira, said to be the name of the tribe to which king Asoka belonged." This is another reason why the Chinese traveller's eye naturally turned that way, as indicated above.

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে পদ্মনাথ

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন মহাকাব্যের মতোই বিশাল ও বর্ণময়। তাঁর আয়ু অল্প হলেও আয়তন অনেক বড়। এ-কারণেই হয়তো-বা তাঁর জীবনের কিছু কিছু অধ্যায় অনালোচিত রয়ে গেছে। এ-রকমই একটি প্রসঙ্গ হচ্ছে তাঁর অসম ভ্রমণ। স্বামীজির অসম ভ্রমণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ রচিত একটি গ্রন্থে। কাশীর ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে তিনি অসম ভ্রমণ-কথা বর্ণনা করেছেন। স্বামীজির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনের বর্ণনাও রয়েছে সেই স্বল্পায়তন গ্রন্থে। ব্যক্তি বিবেকানন্দের অনেক রীতির চমৎকার বর্ণনা রয়েছে পদ্মনাথের লেখায়। তিনি ছিলেন স্বামীজি বিষয়ে অসহিষ্ণু এক ব্যক্তি। ফলে তাঁর রচনায় পাওয়া যায় শংকরীপ্রসাদ বসুর ভাষায় 'এক বিরুদ্ধ সাক্ষী'-র বিবরণ।

এই পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ একজন রবীন্দ্র-বিদূষকও ছিলেন। এ-বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে তাঁর বিবেকানন্দ-বিদূষণের চিত্রটিই আঁকতে চাই।

'আলোচনা চতুষ্টয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিষয়ে নানা প্রসঙ্গে নিন্দুক পদ্মনাথকে নিয়ে যখন চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, সেই আগ্নেয় কালেই তিনি প্রকাশ করেন 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' গ্রন্থ। কাশীর ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক 'সমাজ হিতকর' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় পুস্তক রূপে এটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে অসমে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়। শুধু নিন্দুকের ভূমিকায় নয়, জগদ্‌বিখ্যাত স্বামীজি সম্পর্কে তিনি বেশকিছু প্রশংসাবাক্যও উচ্চারণ করেছেন। সবদিক থেকে বিবেচনা করলে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের এই গ্রন্থ স্বামীজির অসম ভ্রমণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে গণ্য করা যায়।

বিবেকানন্দ-বিদূষক পদ্মনাথের কথা বলবার আগে স্বামীজির প্রতি তিনি যে-প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন তার একটি উৎকলন দেওয়া সংগত— "তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জিনিসই বটে। কি সুমিষ্ট আওয়াজ, কি সুন্দর আবৃত্তি, কি সুষ্ঠু শব্দ যোজনা! বিশেষতঃ প্রথম দিন তাঁহাকে দেখিয়া 'বিবেকানন্দ' বলিয়া ধরিতে পারি নাই— তাঁহার সেই পাগড়ি, সেই আলখেল্লা দেখিয়া মনে হইল— 'হ্যাঁ ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর ছবি পূর্বে দেখিয়াছি।' তাঁহার বক্তৃতার রীতি ছিল পায়চারী করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলা যেন যাত্রাদলের অধিকারী। তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নেত্রদ্বয়, সুস্মিত সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল— এও এক দেখিবার জিনিস। ফলতঃ আজ বিশ বৎসর পরেও যেন সেই মূর্তি চোখে ভাসিতেছে— সেই কণ্ঠস্বর কানে বাজিতেছে। সাধে কি আমেরিকা ক্ষেপিয়াছিল?" ('রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ', পৃ. ২২)

এখানে পদ্মনাথের অন্যরকম পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজির প্রতি প্রীতিময় অনুরাগ এই লেখায় দীপ্র হয়ে উঠেছে। পণ্ডিত ধীরেশ্বর আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় যে-কথোপকথন হয়েছিল সে-বিষয়ে সপ্রশংস আলোকপাত করেছেন পদ্মনাথ। বিবেকানন্দের সংস্কৃত ভাষার উপর অধিকার পদ্মনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে পদ্মনাথ 'আসামে বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ

লেখেন। তার বিশ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ গুয়াহাটি (তৎকালীন গৌহাটি) গিয়েছিলেন সদলবলে। তখন পদ্মনাথ সেন্সাস অফিসে কাজ করতেন। তাই বিবেকানন্দের দর্শনলাভের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের মহাবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে মা-কে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কামাখ্যাতীর্থ দর্শনের জন্য গুয়াহাটি যান। পদ্মনাথ অবশ্য স্বীকার করেছেন যে তিনি কোনো ডায়েরি রাখেননি, স্মৃতি থেকে লিখেছেন, এতে হয়তো-বা দিন-তারিখের কিছুটা গরমিল হতে পারে। তাঁর প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা পদ্মনাথের ভাষাতেই বর্ণনা করি:

"বারান্দায় একখানি টুলের উপর একটি গৌরবর্ণ 'গেরুয়া ধুতি ও গেঞ্জি' পরা লোক একাকী বসিয়া আছেন— চুলগুলি এলোমেলো, পান চিবাইয়া ঠোঁট লাল হইয়াছে; দেখিয়া মনে করিলাম ইনি বোধহয় স্বামীজীর কোন 'চেলা' হইবেন। ইহার পূর্বে স্বামীজীর ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বড় বড় দুইটি চোখ ছাড়া এই মূর্তির সঙ্গে, ছবি দেখিয়া যে মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলাম তাহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই। সে যাহা হউক, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম— স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি— দেখা হইবে কি? ইনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তা আপনাদের কি কথা আছে বলুন।"

স্বামীজির মুখশ্রীর প্রদীপ্ত জ্যোতি দেখেও ভ্রান্তির শিকারে পতিত হয়েছিলেন এই পণ্ডিত। তিনি মন্তব্য করেছেন, "মুখের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য বোধ হয় স্বামীজী গ্লিসারিন মাখিতেন মুখে।"

পদ্মনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হয়েছিল স্বামীজির। স্বামীজি বলেন, 'বৌদ্ধ যুগের পূর্বে এদেশে স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না।' এই উক্তির প্রতিবাদ করে পদ্মনাথ বলেন, 'কেন, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট সৌধ প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।' স্বামীজি বলেন, 'ওসব অত্যুক্তি পরিপূর্ণ বর্ণনা।' তিনি আরও বলেন, 'এই যে আপনার গলায় পৈতা, এটাও পারসিকদের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে।' এই উক্তিরও প্রতিবাদ করে পদ্মনাথ বলেন, 'উপবীত শোধনের যে মন্ত্র আছে তাতে 'যজ্ঞোপবীত' শব্দটি তো স্পষ্ট রহিয়াছে।' স্বামীজি বলেন, 'এ মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত। ইহার শব্দ ও ছন্দ আধুনিক।' এই উত্তর শুনে পদ্মনাথ উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বলেন— 'তাহলে স্বামীজী আপনাতে আর দয়ানন্দে (আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী) কোন প্রভেদ দেখিতেছি না। এরূপ অবস্থায় কোন তর্ক চলিতে পারে না।'

পরের দিন স্বামীজির বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত সে-প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। সেখানেও দলবল-সহ পদ্মনাথ গিয়েছিলেন। শহরে ফিরে এসে শোনেন, স্বামীজির বক্তৃতা হচ্ছে। সেই বক্তৃতার সময়ও বিবেকানন্দ পদ্মনাথের প্রসঙ্গ তুলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'সেই ভট্চায্যি কোথায়? কোন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, সে সম্পর্কে কিছু বলি।' প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে তখন পদ্মনাথ দাঁড়িয়েছিলেন, স্বামীজির কাছাকাছি গিয়ে কোনো প্রশ্ন করবার সুযোগ ছিল না। ওই বক্তৃতায় দুটি নতুন শব্দ শুনেছেন বলে পদ্মনাথ মন্তব্য করেন। একটি 'হাড়িধর্ম' ও একটি 'ছুৎমার্গ'। ওই বক্তৃতায় স্বামীজি অস্পৃশ্যতা ও খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। সমগ্র জাতির ঐক্য সাধনে এটা বড় বাধা বলে উল্লেখ করেন। এই বক্তব্য শুনে পদ্মনাথ মন্তব্য করেন— "চিকাগো বক্তৃতা অথবা অপর যে সকল বক্তৃতা পড়িতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল ইতি একজন বেদান্তবাদী ধর্ম প্রচারক, কিন্তু ঐদিনকার বক্তৃতায় বুঝিলাম যে, ধর্মপ্রচার একটা 'খোলস' মাত্র, ভিতরে স্বতন্ত্রভাব।" (পৃ. ২১)

পরবর্তী দু-দিন রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা হয়েছিল। প্রথমদিন জনৈক বাঙালি উকিল সভাপতি হয়েছিলেন। সেই দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল— 'Trans-migration of the soul'। দ্বিতীয় দিনে আসাম ভ্যালি ডিভিশনের কমিশনার এ. পোর্টিয়াস সভাপতিত্ব করেছিলেন। সে-দিনের বিষয় সম্পর্কে পদ্মনাথ সন্দিহান। তবে তিনি অনুমান করেন 'Vedanta in India life' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। সেদিন সভায় অনেক ইংরেজ সাহেব-বিবি উপস্থিত হয়েছিলেন। তার পর স্বামীজি শিলং চলে যান। সেখানে স্বামীজির সম্মানে অসমের চিফ কমিশনার স্যার হেনরি কটন সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। স্বামীজি শিলঙের বক্তৃতায় বলেন, "তীর্থস্থান পরিভ্রমণই সন্ন্যাসীদের কর্তব্য, তাই কামাখ্যা হইয়া শিলং-এ আসিয়াছি। এস্থানেও হেনরী কটনের ন্যায় সাধুপুরুষ রহিয়াছেন— তাই ইহাও একটি তীর্থ— তীর্থী কুর্বন্তি সাধবঃ।"

শিলং থেকে ফিরে এসে স্বামীজি আরও ৪৮ দিন গুয়াহাটিতে অবস্থান করেন। সে-সময় একটি নির্জন ঘরে বসে অত্যন্ত অমায়িক ভাবেই পদ্মনাথের সঙ্গে আলাপ করেন। বিবেকানন্দ তখন হাঁপানি রোগে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলেন। পদ্মনাথ চিকাগো বক্তৃতার একটি শব্দ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। বলেন,

'মূর্তি পূজাটা কি vulgar?' স্বামীজি উত্তর দেন, 'আমি vulgar শব্দটি প্রয়োগ করিনি। করেছিলাম, vulgas-people।' দীর্ঘ আলোচনার শেষে বিবেকানন্দ-বিদূষক পদ্মনাথ একটি শ্রদ্ধেয় মন্তব্য করতে বাধ্য হন। তিনি লেখেন, "মনে হইল যে এই সন্ন্যাসীর সাজ পরা লোকটি যেন 'মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত' একটি কেশরী।" (পৃ. ২৫)

উল্লেখিত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়টিতে স্বামীজি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পদ্মনাথের সমীক্ষা আজব ভাষায় লেখা হলেও চিন্তনের গভীরতাকে অস্বীকার করা যায় না। বিবেকানন্দের বিভিন্ন ভাষণে বিরুদ্ধপক্ষ হিসাবে এক রীতির চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় সে-লেখায়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন প্রাজ্ঞজন তার প্রতিবাদ করেছেন। চন্দ্রদত্ত বর্মা প্রতিবাদী বক্তব্য পেশ করেছিলেন। পদ্মনাথ সে-সম্পর্কেও গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'গ'-তে আলোচনা করেছেন।

বিবেকানন্দ-পদ্মনাথ প্রসঙ্গ নানা কারণেই আলোচনার দাবি রাখে। একদিকে অসম ভ্রমণের উপাত্ত হিসাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পদ্মনাথের রচনাকে গ্রহণ করার সাপেক্ষতা রয়েছে। অন্যদিকে একজন বিরুদ্ধবাদীর মতাদর্শ জানার জন্যও বিবেকানন্দ-গবেষকদের পদ্মনাথ-চর্চা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য মনোভঙ্গি কীভাবে স্বামীজির চিন্তাকে বিচার করেছিল সেটাও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ-কারণেই বিশাল প্রেক্ষাপটে স্বামীজির জীবনায়নের রূপরেখা নির্মাণে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য। ❑

[নিবন্ধকার বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার এক সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং শ্রীমঙ্গল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সহ-সভাপতি। রচনাটি প্রথমে মৌলভিবাজার রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির 'উৎসর্গ' স্মারকগ্রন্থে প্রকাশ পায় ২০০৯ সালে, পরে শ্রীমঙ্গল থেকে প্রকাশিত লেখকের 'বিনায়ক বিবেকানন্দ' শীর্ষক পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (পৃ. ৪৪-৪৭)। নিবন্ধকারের অনুমতি নিয়ে রচনাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।]

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩'-সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ডস কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি-সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যে-সব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর আরও একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালৈকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি গ্রহণের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ৪ জুলাই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশংকর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী নীলমণি ফুকন

অনেকের কাছে অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' হিসেবে তাঁর পরিচয়, তবে তিনি যে অসমিয়া কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক রূপেও।

কীর্তিনাথ ফুকন ও বরদাবালা দেবীর পুত্র নীলমণির জন্ম উজান অসমের দেরগাঁও-এ, ১৯৩৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সেখানেই কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। দেরগাঁও হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান, সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ ১৯৯২ সালে।

নীলমণি শুধুই সমাজ-সচেতন কবি নন, দেশ ও রাজ্যের সমকালীন যাবতীয় বিষয় তাঁকে ভাবায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হয়ে উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর অনায়াস বৈদগ্ধ্যের পিছনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনলস অধ্যয়ন। তিনি যেমন খুবই কম লেখেন, তেমনই কবি হিসাবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা বিলম্বে। নীলমণির প্রথম কবিতা-সংকলন 'সূর্য হেনো নামি আহে এইনদীয়েদি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, রঙিয়ার 'প্রকাশন ঘর' থেকে। দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'নির্জনতার শব্দ' প্রকাশ পায় গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'দত্ত বরুয়া' থেকে। এখন পর্যন্ত আটটি কাব্যগ্রন্থের জনক, যার মধ্যে রয়েছে 'আরু কি নৈঃশব্দ্য' (১৯৬৮), 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে' (১৯৭২), 'কাঁইট, গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫), 'কবিতা' (১৯৮১), 'নৃত্যরতা পৃথিবী' (১৯৮৫) এবং 'অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলো' (২০০৩)।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন : 'গোলাপী জামুর লগ্ন' (বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৯৭৭), 'সাগরতলীর শঙ্খ' (ড. হীরেন গোহাঁই সম্পাদিত, লয়ার্স বুক স্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯৪) এবং 'নীলমণি ফুকন : সম্পূর্ণ কবিতা' (অর্থাৎ, গুয়াহাটি, ২০০৬)। নীলমণির বাংলায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থও তিনটি : 'নির্বাচিত কবিতা : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক তড়িৎ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪), 'পড়োশি গোলাপ : নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রমানাথ ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭) এবং 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রবীন্দ্র সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৭)। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিলেক্টেড পোয়েম্স : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক কৃষ্ণদুলাল বরুয়া, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ২০০৭), তা ছাড়া 'বিচিত্র লেখা', যা কয়েকটি নির্বাচিত গদ্য ও অনূদিত কবিতার সংকলন (বনফুল, ২ ০১০)। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বইগুলি হল 'লোক কল্পদৃষ্টি' (১৯৮৭), 'রূপ বর্ণ বাক্' (১৯৮৮), 'শিল্পকলা দর্শন' (১৯৯৮) এবং 'শিল্পকলার উপলব্ধি আরু আনন্দ' (অন্বেষা, ২০১২)। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির নাম 'পাতি সোনারুৱা ফুল' (২০০৬)।

কবি হিসাবে ১৯৮২ সালে নীলমণি ম্যাসিডোনিয়ায় 'স্ট্রুগা পোয়েট্রি ইভনিং'-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অসম সাহিত্য সভার 'রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার' (১৯৭২), কবিতার জন্য অসম প্রকাশন পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮১), 'লোক কল্পদৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য জগদ্ধাত্রী হরমোহন পুরস্কার (১৯৮৮), অসম সাহিত্য সভার 'ছগনলাল জৈন পুরস্কার' (১৯৯১), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার' (১৯৯৪), উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত 'অসম উপত্যকা পুরস্কার' (১৯৯৮), ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০০), জোশুয়া ফাউন্ডেশনের 'জোশুয়া সাহিত্য পুরস্কারম' (হায়দরাবাদ, ২০০১), গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার (সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা, ২০০২)। এ-ছাড়া পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন (১৯৯০), নয়াদিল্লির মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সম্মানিত সদস্য ছিলেন (১৯৯৯-২০০১) এবং ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো'।

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহ বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকলেও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর কবিজীবন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতার সমবয়সি। কিশোরদের পত্রিকা 'রামধনু'-তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। এবং আজও তাঁর সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আইনজীবী পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল ও হিরণময়ী দেবীর পুত্র তরুণের জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় শাহাজাদপুর পরগনার পোরজনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর (১২ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পোরজনা ছাড়াও বাঁকুড়া, রাজশাহি ও বর্ধমান জেলা এবং কলকাতায়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৭ সালে কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ সালে সহাধ্যক্ষ হিসাবে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তরুণ সান্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুবাদে মাত্র দশ বছর বয়সেই বাঁকুড়ার এক মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁদানে গ্যাসে আহত হন। শেষ-কৈশোরেই (১৯৪৯-৫০) নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলা কারাগারে অন্তরিন হন, পরেও একাধিক বার রাজবন্দি হয়েছেন। সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনেও। কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী তরুণ ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে যেমন প্রচারে নেমেছেন, তেমনই যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও, ওই অস্থির দিনগুলোতে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়দান ও জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার আহ্বায়ক এবং ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক (১৯৭২-৮১)। ১৯৮১ সালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্য ও চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এখন পর্যন্ত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চব্বিশ। সাম্প্রতিকতম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাউকুড়ানির ব্রহ্মাণ্ডাঙা' (২০০৯) এবং 'হাত ভরা ফুলের গল্প' (২০১০)। 'সর্বেশ্বরী শব্দেশ্বরী', 'মরিয়মের মীরা', 'অচিন পাখির একা', 'সন্ত্রাসে সংলাপে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। তা ছাড়া রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ, কলকাতা), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ঢাকা), 'কবিতা সংগ্রহ' দুই খণ্ড (দে'জ) এবং 'কবিতা সমগ্র' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (দিয়া প্রকাশন)। তিনি মোট ৪২টি কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ৩৫টি গ্রন্থভুক্ত। তাঁর অনূদিত কবিতার বই তিনটি এবং চারটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আট।

যে-সব পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তরুণ যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা' (১৯৫৫), 'কবিপত্র' (যুগ্মভাবে, ১৯৫৮), 'সীমান্ত' (১৯৬২-৬৭), 'পরিচয়' (যুগ্মভাবে, ১৯৬৭-৭৫), 'রুশ-ভারতী' (১৯৭২-৮১), এ-ছাড়া ২০০২ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

বাংলাভাষায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি হিসাবে চিহ্নিত তরুণ সান্যাল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭১), বিষ্ণু দে স্মারক সম্মান, রামমোহন সম্মান, বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও প্রায় ২০টি সম্মান, ভারতভাষা ভূষণ সম্মান (১৯৯৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৬), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মান (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অসমিয়া কাব্যভুবনে নীলমণি ফুকনকে যদি বলা হয় অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' তাহলে অসমের 'বুদ্ধদেব বসু' হিসেবে নিশ্চয় পরিচিত হওয়া উচিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন ঠিক বুদ্ধদেব বসুর মতোই। পাশাপাশি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও নিখাদ গদ্য। বস্তুত কাব্যজগতে এই কবি বেশ দেরিতে প্রবেশ করেছেন বলা যায়। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি যে-নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন তা পরবর্তী কালেও অম্লান রয়েছে।

১৯৩৭ সালের পয়লা মার্চ যোরহাট জেলার তিতাবরে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। পড়াশোনা তিতাবর স্কুল থেকে গুয়াহাটির কটন কলেজ (ইংরেজিতে অনার্স) হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার লেকচারার হিসেবে যোগ দেন, ১৯৮২-তে রিডার পদে উন্নীত হন এবং ২০০০ সালে কর্মজীবনের ইতি টানেন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকেই।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ তিনটি— 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা' (১৯৮১), 'মানুহ অনুকূলে' (২০০০) ও 'পল অনুপলর আঁচ' (২০০৭)। পাশাপাশি লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা। তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন 'কিতাপর ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তাঁর প্রবন্ধের আরেকটি বই 'নির্বাচিত সমালোচনা'। ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা করেছেন প্রদীপ আচার্য অনূদিত 'ওআন হানড্রেড ইয়ার্স অব অ্যাসামিজ পোয়েট্রি'। অসম সরকারের প্রকাশনা পর্ষৎ প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হীরেন্দ্রনাথ-লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুহ অনুকূলে'র জন্য ২০০৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অসমিয়া কবিতায় নিয়ে এসেছেন মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের এক বিশেষ ঝলক। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুই সংখ্যা দিয়ে নিজেকে সমকালীন রাখা নয়, হীরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অনেকটা নির্জনে, একাকী। কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন সবই হয়ে ওঠে মন্ত্র। তাঁর ভাষা চিত্রধর্মী, কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির কোল থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে সংগীতময়তার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার প্রিয় বিষয়।

১৯৮৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ ভূপালের ভারত ভবনে যোগ দেন 'কবি ভারতী কবিসম্মেলন'-এ। দু-বছর পর 'অসম সাহিত্য সভা'-র ডুমডুমা অধিবেশনের কবিসম্মেলনের তিনিই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। অসমের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'গরীয়সী' ও 'প্রকাশ'-এ তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু অসমিয়া নয়, তাঁর শাণিত মেধা ঝরে পড়েছে ইংরেজিতেও। সাহিত্য অকাদেমির গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী স্বপন সেনগুপ্ত

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ : পাখি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ত্রিপুরার কবি স্বপন সেনগুপ্তের বয়স মাত্র একুশ বছর। কবিরা সাধারণত হাত পাকান লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অথচ এই কবি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখার আগেই নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর যখন তিনি লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'নান্দীমুখ' বের করলেন, অচিরেই সেটি হয়ে উঠল শুধু ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট পত্রিকা।

কবি স্বপন সেনগুপ্তের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২ ডিসেম্বর। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়া। শেষপর্যন্ত সাহিত্য বিষয়েই পিএইচডি। ছাত্রজীবনেই কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেন নিজ কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দু-বছর পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নান্দীমুখ'। বাংলা ভাষার বহু উল্লেখযোগ্য কবি এই পত্রিকায় লিখেছেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('এ আমার ভিখিরি হাত নয়') প্রকাশিত হয় দীর্ঘদিন পরে, ১৯৮৫ সালে। সে-বছরই আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া'। এমন নয় যে এই কবি শুধু নিজের কাব্যভুবনেই আত্মমগ্ন। বরং তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা লেখালিখির জগতের সঙ্গে। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', যেখানে রয়েছে ত্রিপুরার ১২ জন বিশিষ্ট কবির কবিতা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'গঙ্গা গোমতী'। একই সময়ে স্বপন সেনগুপ্ত কিন্তু নিজস্ব পত্রিকা 'নান্দীমুখ'ও সম্পাদনা করে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আরও দুটি গ্রন্থ—যথাক্রমে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' ও 'অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা ও কাব্যালোচনা'।

বর্তমান শতকে প্রকাশিত স্বপনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হল 'ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী', 'যুগলবন্দি তুফান', 'দহন ও জলস্তর', 'কবিতা সমগ্র-১' ও 'হারানো ঢেউয়ের জলপাই শিস'। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এ ছাড়া রয়েছে গদ্যগ্রন্থ 'স্বনির্বাচিত লেখালেখি' (২০০৬)।

স্বপন সেনগুপ্ত 'নান্দীমুখ' সম্পাদনা করেছেন ২৭ বছর। সম্পাদনা করেছেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পাক্ষিক পত্রিকা 'গোমতী'ও। কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও স্বপন সেনগুপ্তের গদ্যের হাতটি যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন সাময়িকী ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। 'বিশ্ববাংলা কবিতা সংকলন' ও 'পেঙ্গুইন বুকস্'-এর Dancing Earth কাব্য সংকলনে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন স্বপন তার মধ্যে রয়েছে সারা বাংলা কবি সম্মেলন থেকে সংবর্ধনা (১৯৭২), ত্রিপুরা সরকারের কবি সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (২০০৬), রবীন্দ্র পরিষদ থেকে বিজনকৃষ্ণ সাহিত্য পুরস্কার (২০০৭), ত্রিপুরা সরকারের কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার (২০১১) এবং ঢাকায় জাতীয় কবিতা পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ (২০১৩)।

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

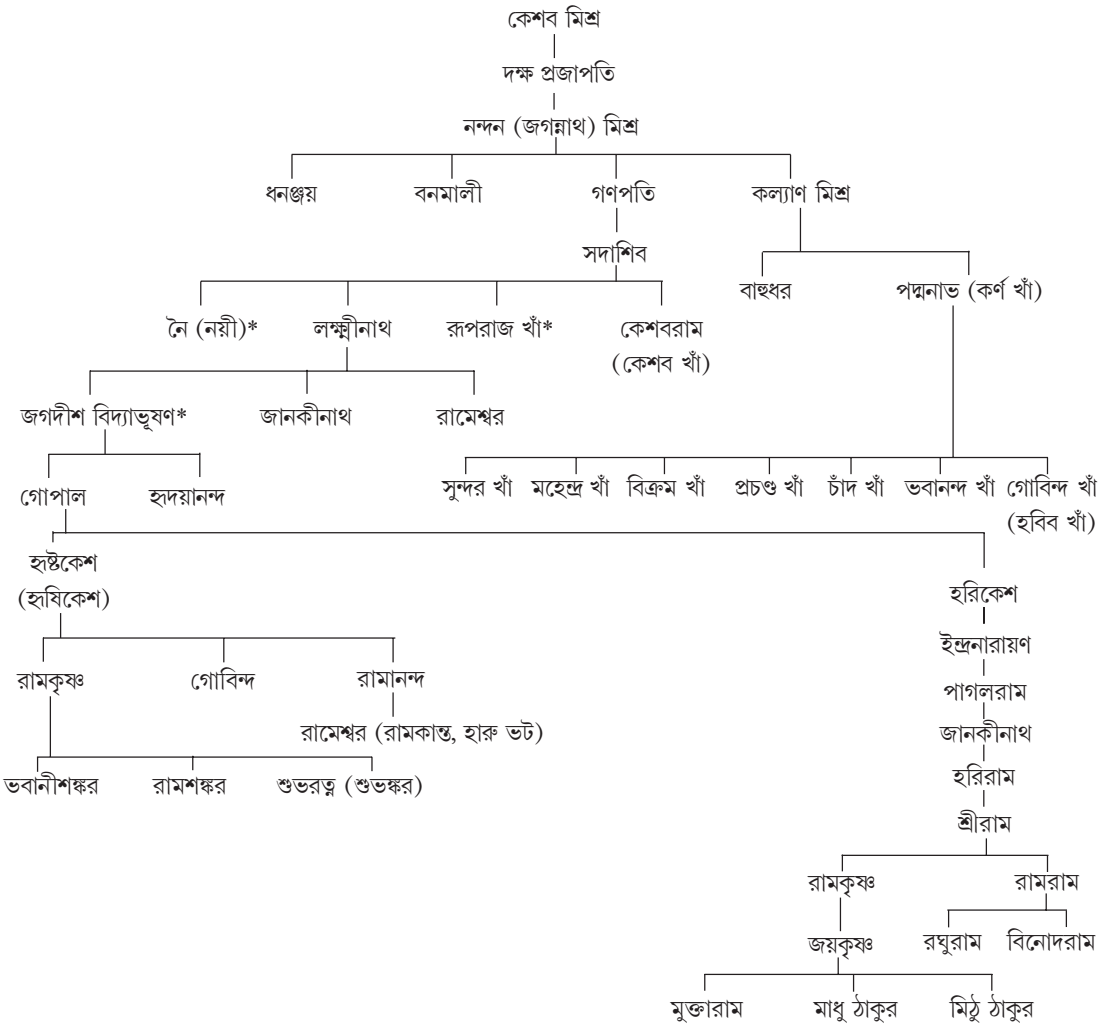

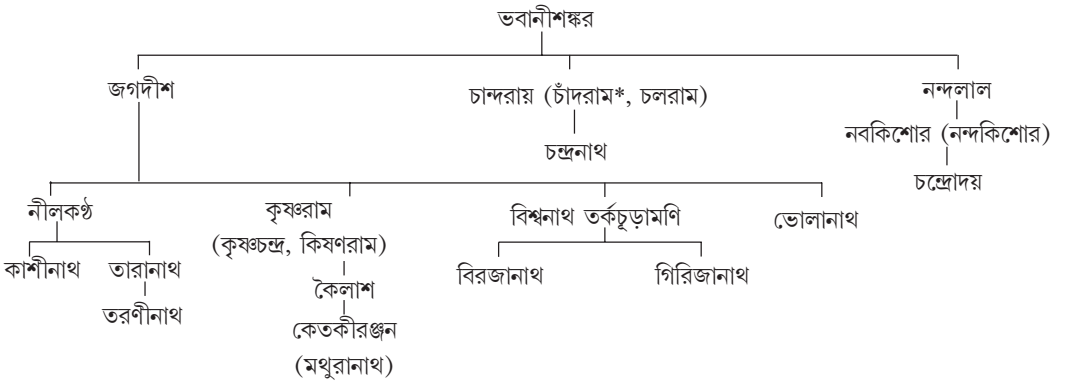
ভবানীশঙ্কর
জগদীশ
চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
নন্দলাল
চন্দ্রনাথ
নবকিশোর (নন্দকিশোর)
চন্দ্রোদয়
নীলকণ্ঠ
কৃষ্ণরাম
(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
ভোলানাথ
কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)
বিরজানাথ
গিরিজানাথ

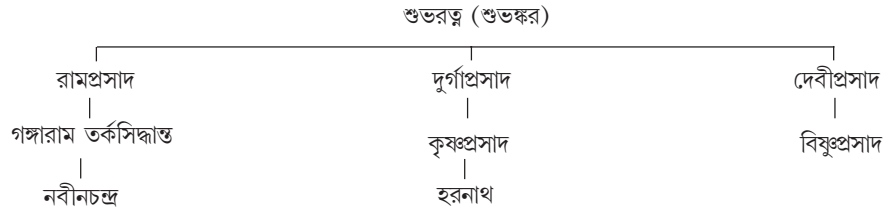
শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
রামপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
কৃষ্ণপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ
নবীনচন্দ্র
হরনাথ

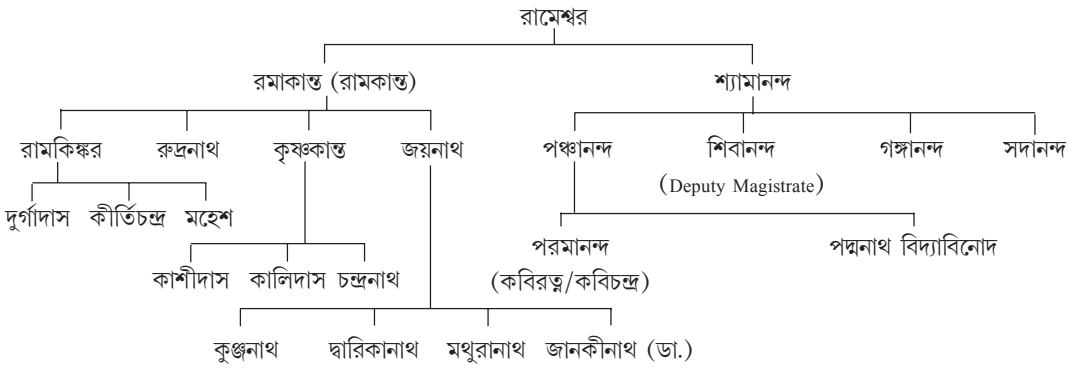
রামেশ্বর
রমাকান্ত (রামকান্ত)
শ্যামানন্দ
রামকিঙ্কর
রুদ্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
জয়নাথ
পঞ্চানন্দ
শিবানন্দ
(Deputy Magistrate)
গঙ্গানন্দ
সদানন্দ
দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ
পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
কাশীদাস
কালিদাস
চন্দ্রনাথ
কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

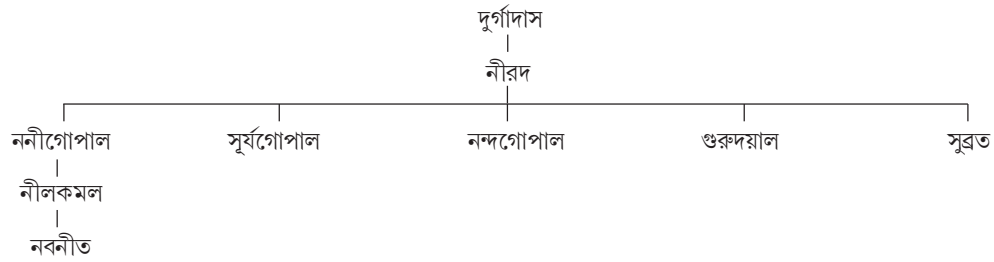
দুর্গাদাস
নীরদ
ননীগোপাল
সূর্যগোপাল
নন্দগোপাল
গুরুদয়াল
সুব্রত
নীলকমল
নবনীত

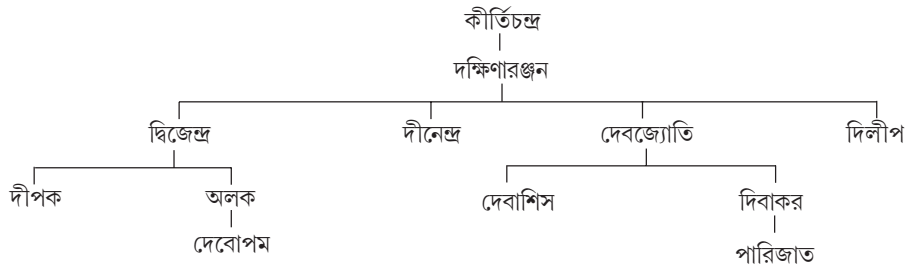

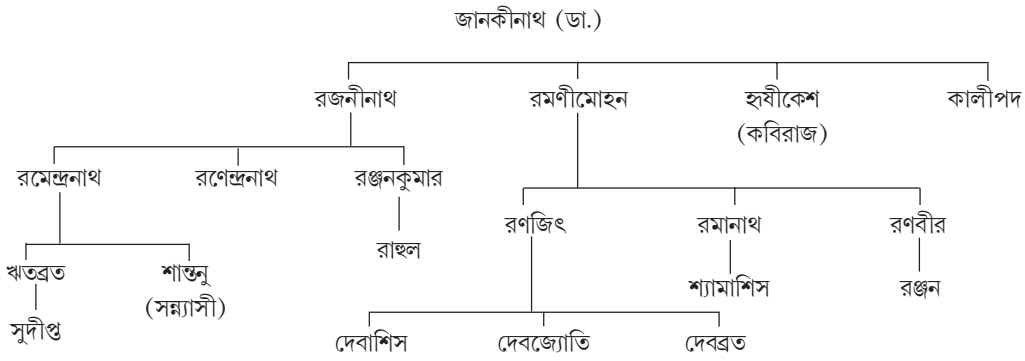

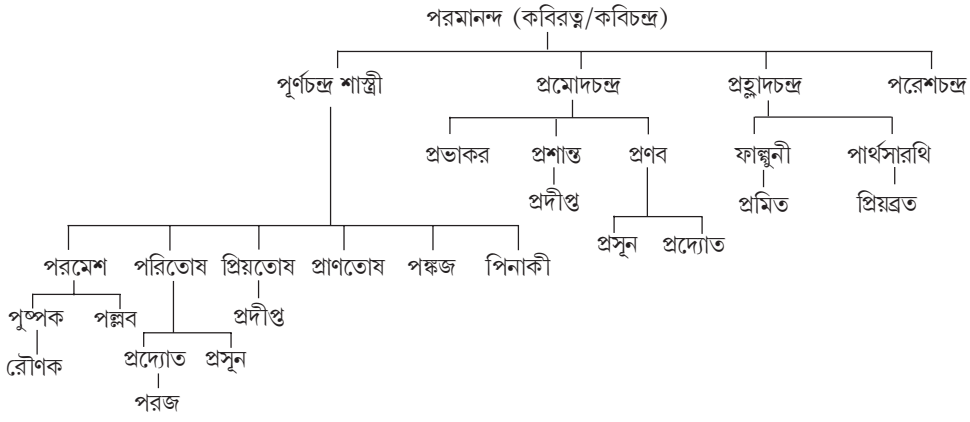

- কীর্তিচন্দ্র
  - দক্ষিণারঞ্জন
    - দ্বিজেন্দ্র
      - দীপক
      - অলক
        - দেবোপম
    - দীনেন্দ্র
    - দেবজ্যোতি
      - দেবাশিস
      - দিবাকর
        - পারিজাত
    - দিলীপ

- জানকীনাথ (ডা.)
  - রজনীনাথ
    - রমেন্দ্রনাথ
      - ঋতব্রত
        - সুদীপ্ত
      - শান্তনু (সন্ন্যাসী)
    - রণেন্দ্রনাথ
    - রঞ্জনকুমার
      - রাহুল
  - রমণীমোহন
    - রণজিৎ
      - দেবাশিস
      - দেবজ্যোতি
      - দেবব্রত
    - রমানাথ
      - শ্যামাশিস
    - রণবীর
      - রঞ্জন
  - হৃষীকেশ (কবিরাজ)
  - কালীপদ

- পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
  - পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী
    - পরমেশ
      - পুষ্পক
        - রৌণক
      - পল্লব
    - পরিতোষ
      - প্রদ্যোত
        - পরজ
      - প্রসূন
    - প্রিয়তোষ
      - প্রদীপ্ত
    - প্রাণতোষ
    - পঙ্কজ
    - পিনাকী
  - প্রমোদচন্দ্র
    - প্রভাকর
    - প্রশান্ত
      - প্রদীপ্ত
    - প্রণব
      - প্রসূন
      - প্রদ্যোত
  - প্রহ্লাদচন্দ্র
    - ফাল্গুনী
      - প্রমিত
    - পার্থসারথি
      - প্রিয়ব্রত
  - পরেশচন্দ্র

- পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
  - পুণ্ডরীকাক্ষ (ডা.)
    - শক্তিপ্রসাদ
      - কৃষ্ণেন্দু
      - শুভ্রেন্দু
  - বিরূপাক্ষ
    - দেবীপ্রসাদ
      - নবারুণ
      - নীলাঞ্জন
      - সুমাল্য
    - রমাপ্রসাদ
      - রূপায়ণ
    - দেবপ্রসাদ
      - কৌস্তভ
    - হরপ্রসাদ
    - কালীপ্রসাদ
      - অনুভব
    - দুর্গাপ্রসাদ
    - বাণীপ্রসাদ
      - নীলাভ
    - সতীপ্রসাদ

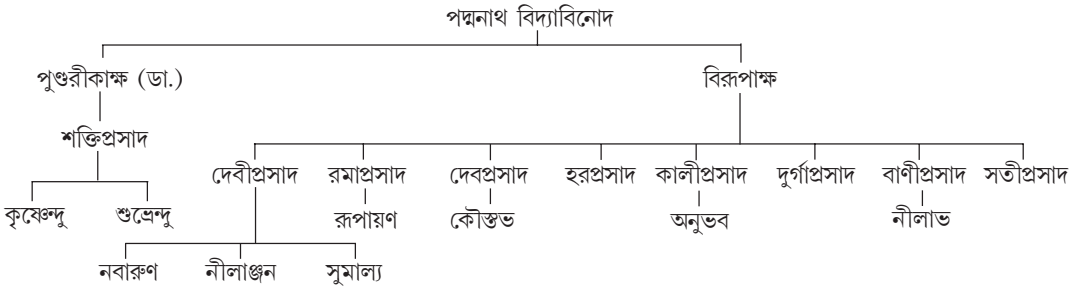

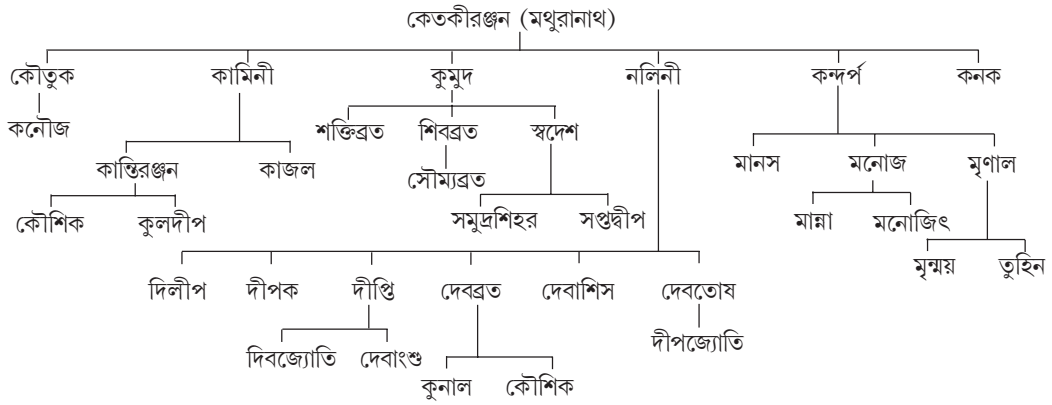
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
সৌম্যব্রত
স্বদেশ
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দিবজ্যোতি
দেবাংশু
দেবব্রত
কুনাল
কৌশিক
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মান্না
মনোজিৎ
মৃণাল
মৃন্ময়
তুহিন
কনক

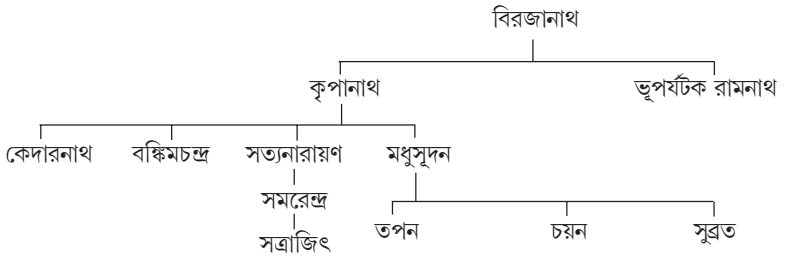
বিরজানাথ
কৃপানাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
মধুসূদন
তপন
চয়ন
সুব্রত
ভূপর্যটক রামনাথ

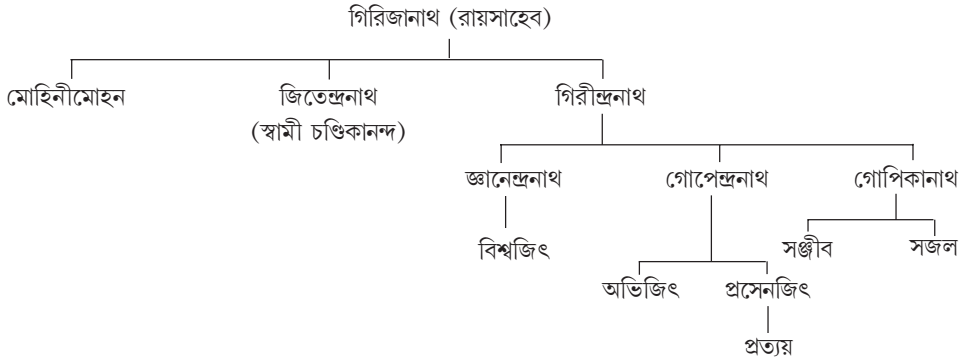
গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল

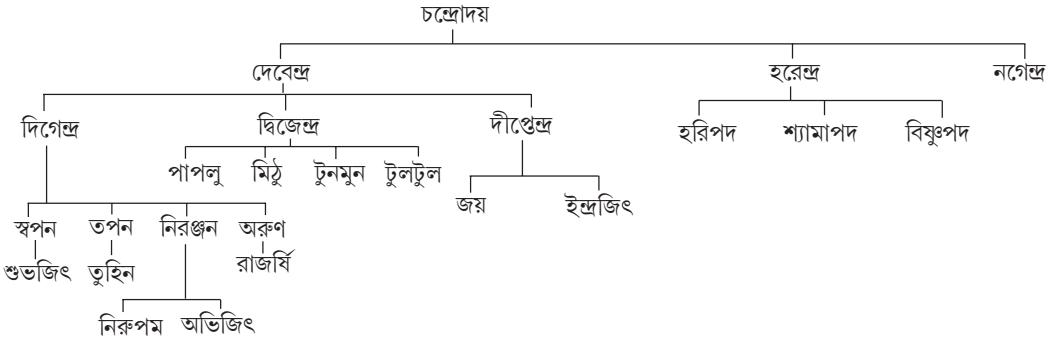
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

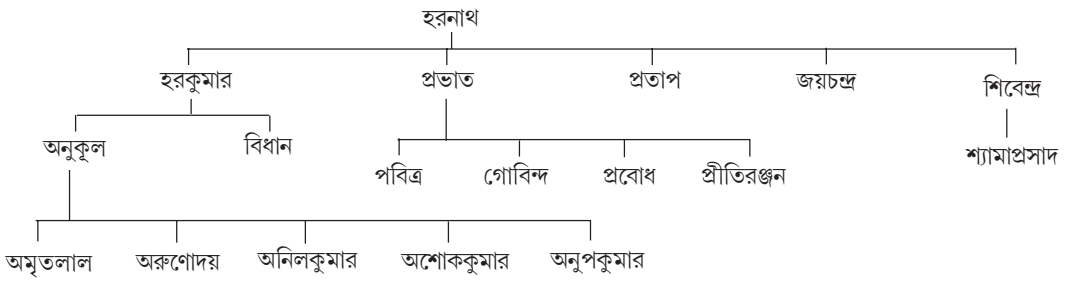

সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে — এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্তু) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তার কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। তবে দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়! ❑

মতামত

(এক)

মূল্যবান সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত

Prof. Arun Kumar Mukherjee
Formerly Head Dept. of Bengali
Chairman, Dept of Higher Studies in Bengali
University of Calcutta
86/1, College Street, Kolkata-700073

ADRIJA (2nd Floor)
N.S.C. Bose Road, Subhas Pally
Siliguri-734001
Ph.: 0353-2002511
Date: 10.04.13

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা— প্রতিবাদের কবিতা, দ্রোহবুদ্ধির কবিতা, বাঁধনছেড়ার কবিতা। চল্লিশের দশকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত মূল্যবান ভাষণ (অসমে প্রদত্ত) আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে দলিল। এই দশকটির আসল চেহারা এখানে রূপায়িত। এই ভাষণের জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। তা আমাদের বারবার উদ্‌বুদ্ধ করে, কালসচেতন করে তোলে।

এটি আমার মূল্যবান সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বারেবারে এটি আমাকে ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য ধন্যবাদ অসমের সেই প্রতিষ্ঠান [রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন]কে— যাঁরা এই ভাষণ দানের জন্য আহ্বান করেছেন ডক্টর সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়কে। এবং সেইসঙ্গে বক্তাকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল ২০১৩।

(দুই)

তথ্যবহুল ও মনোজ্ঞ

হাওড়া
২৯.০৭.২০১৩

শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ পেয়েছি। ২০১২ সালের জন্য পদ্মনাথ স্মৃতি পুরস্কার কবি নীলমণি ফুকন এবং রামনাথ স্মৃতি পুরস্কার কবি তরুণ সান্যালকে অর্পণ করা হয়েছে। এই দুই শ্রদ্ধেয় কবির পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমি আনন্দিত।

স্মারক বক্তৃতা দুটি মূল্যবান। শ্রীমন্ত শংকরদেব সম্পর্কে তথ্যবহুল রচনাটি পড়ে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু অবহিত হলাম। চল্লিশের দশকের প্রতিবাদী কবিতার কবিদের নিয়ে আলোচনাটিও মনোজ্ঞ। চল্লিশের প্রধান কবিরা সকলেই প্রায় তাঁর (সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়ের) নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

শ্রদ্ধার্ঘ্যের দুটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ও পদ্মনাথ এবং ইতিমধ্যে পুরস্কার প্রাপ্ত ছ'জন কবির পরিচিতি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জি সম্পর্কে আমার সপ্রশংস বিস্ময়ের এবং মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলাম। ২০১৩-র স্মারকগ্রন্থটি রচনার উৎকর্ষে এবং মুদ্রণ-পারিপাট্যে শোভন সুন্দর।

সংক্ষিপ্ত অভিমত পাঠালাম। সপরিবার কুশলে থাকুন, সুস্থ থাকুন।

বিনীত

অজিত বাইরী

(তিন)

ফাউন্ডেশন দীর্ঘায়ু হোক

কবি রমানাথ ভট্টাচার্য,
মালাড (পশ্চিম), মুম্বাই।

কবিবরেষু,

যথাসময়ে আপনার পাঠানো... রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের স্মারকগ্রন্থ পেয়েছি।...

স্মারকগ্রন্থটি পড়েছি। বাংলার বাইরে এমন সুন্দর উদ্যোগ আর কোথাও আছে কি না জানি না। রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন দীর্ঘায়ু হোক। আদ্যোপান্ত পড়ে সুখ পেলাম। নমস্কারান্তে

শিবব্রত দেওয়ানজী

১২.৮.২০১৩
ব্লক-২৮ প্লট-৮
নেহরুনগর (পশ্চিম)
ভিলাই-৪৯০০২০, ছত্তিসগঢ়।

(চার)

হবিগঞ্জে রামনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশন

১৬-০৮-২০১৩
শ্রীমঙ্গল (বাংলাদেশ)

কবি রমানাথ ভট্টাচার্য

মানভাজনেষু,

স্মারকগ্রন্থ দুটি পেয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রাপ্তিস্বীকার করছি।...

স্মারকগ্রন্থে আগের লেখাগুলিই ছেপেছেন। স্মারক বক্তৃতাগুলি নতুন। পড়ে ভালো লেগেছে। বিস্তারিতভাবে বলা এখানে সম্ভব নয়। প্রশান্তবাবু ও শ্যামসুন্দরবাবুর লেখা তো আগেই পড়েছি।

আমার লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠালাম।... আমার এখন পদ্মনাথ বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ হল। একটা ছোট্ট পুস্তিকা করে ফেলা যায়। 'কামরূপশাসনাবলী' বিষয়েও একটি প্রবন্ধ লিখব, বইটি সংগ্রহ করা গেলে। বেশ বড়সড় প্রবন্ধ হবে।...

শুনে সুখী হবেন যে হবিগঞ্জ শহরে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশন স্থাপিত হয়েছে। ওঁরা রামনাথের রচনাবলি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ-পর্যন্ত তিনটি বই পাওয়া গেছে। দুর্লভ বইগুলি কীভাবে সংগ্রহ করা যায় এ-জন্য ভাবিত আমরা। আমাকে একজন উপদেষ্টা করেছেন তাঁরা। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমি আপনার ঠিকানা দিয়েছি।...

অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার খুব পত্রালাপ ছিল। অনেক চিঠি আছে তাঁর আমার কাছে। ইদানীং একটা বইও

বের করেছি তাঁর সম্পর্কে। তবে তাঁর সম্পাদিত 'দেবীযুদ্ধ' বইটি সংগ্রহ করতে পারিনি। ওই বইটির খুব দরকার আমার। গুয়াহাটিতে কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি আছেন যিনি আমাকে বইটি পাঠাতে পারেন? তাহলে খুব উপকার হয়। প্রণতি জানাই।

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

(পাঁচ)

সাহিত্যের রসদ ও গবেষণার উপাদান

প্রিয় সুকুমারদা,

নমস্কার। আশা করি সার্বিক সুস্থ আছেন।

কবি রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন থেকে পাঠানো দুটি স্মারক পুস্তিকা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ এর ভেতরে দুজন কৃতবিদ্য মানুষের জীবনপঞ্জি সহ মূল্যবান কিছু সাহিত্যের রসদ ও গবেষণার উপাদান রয়েছে। এটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সুন্দর ও মনোযোগী সম্পাদনা এবং সম্পর্কযুক্ত বিষয় নির্বাচনে আপনার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে প্রাণিত করেছে।

কবি রমানাথবাবু একটি উপযোগী সংস্থা গড়ে তুলেছেন যা বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পর্কসূত্রকে রক্ষা করছে ও করবে।... এই প্রতিষ্ঠানের চিরস্থায়ী কর্মজীবন কামনা করি। কবি রমানাথ ভট্টাচার্যকে আমার সম্মানপূর্বক নমস্কার ও অভিবাদন জানাবেন।

কমলেশ দাশগুপ্ত

৭ আগস্ট ২০১৩
৩৯, মহিম দাস রোড
চট্টগ্রাম-৪০০০ (বাংলাদেশ)।

(ছয়)

স্মারকগ্রন্থ অমূল্য সম্পদ

Prof. I. Sarkar
Department of History
University of North Bengal
Raja Rammohunpur
P.O. North Bengal University
Dist. Darjeeling-734013
West Bengal (India).
22.8.13

শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্যবাবু,

দেখতে দেখতে বেশ ক'দিন হয়ে গেছে। আপনার পাঠানো 'স্মারকগ্রন্থ' দুটো পেয়েছি। বহুবিধ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় ঠিক দু-কথা লিখে যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাব, সময় পাইনি। মাঝখানে গুয়াহাটিতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির ১০০ বছর পূর্তি হয়ে গেল। সেখানে কারও মুখে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করতে শুনলাম না। প্রসঙ্গত আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল ওখানে থাকবার। যা হোক, পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের সম্বন্ধে আমি কিছু লেখার চেষ্টায় আছি— আপনাদের স্মারকগ্রন্থটি আমাকে বিশেষ সাহায্য করবে— আশা রাখি।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ইদানীং সবকিছুই যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। আসুরিক শক্তির কাছে দৈবশক্তি কি হার স্বীকার করছে! এ তো হবার নয়! জানি না অবশ্য— সবই সেই পরমকরুণাময়ের খেলা!

পদ্মনাথ ও রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান (২০১১, ২০১২) উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ দুটি আমার জীবনে অমূল্য সম্পদ হিসেবে রক্ষিত থাকবে।

ঈশ্বর আপনাদের ভালো ও সুস্থ রাখুন।

শ্রদ্ধান্তে

ইছিমুদ্দীন সরকার

(সাত)

অনেক অজানা তথ্য দিয়েছে

চন্দননগর

১৭.৯.১৩

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য

মান্যবরেষু,

আপনার পাঠানো 'স্মারকগ্রন্থ' সময়মতো পেলেও পড়া ও লেখার সময় পাইনি। ব্যস্ততা ছাড়াও পারিবারিক অসুস্থতা, নিজের শারীরিক কিছু অসুবিধার জন্য মতামত দিতে পারিনি।

প্রথমেই বলি, গুয়াহাটিতে রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সাহিত্যসভা ও স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান সম্পর্কিত অনুষ্ঠান আমার ভালো লেগেছিল। ব্যবস্থা, আয়োজন ও আপ্যায়ন ত্রুটিহীন মনে হয়েছিল। সর্বোপরি ছিল নিবিড় আন্তরিকতা। যা আজও আমি ও আমার পুত্র ঋতম্ স্মৃতিচারণ করি।

২০১২-র পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার অনুষ্ঠানের বিবরণ ও স্মারকগ্রন্থের রচনাগুলি পড়লাম। এ-বছর যে-দুজন কৃতী কবির হাতে পুরস্কার দিয়েছেন, দুজনেই আমার কাছে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়। বিশেষত কবি তরুণ সান্যালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় পিতা-পুত্রের। কবি হিসেবে নীলমণি ফুকনকে আমি পছন্দ ও শ্রদ্ধা করি।

স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত অমলেন্দুবাবুর লেখা/স্মারক বক্তৃতা 'শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান' অনেক অজানা তথ্য দিয়েছে। যদিও এ-বিষয়ে তিনি অন্যত্র কিছু কিছু বলেছেন ও লিখেছেন শুনেছি। এটা ওঁর প্রিয় বিষয়। সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ আগেও পড়েছি। সতথ্য লেখাই ওঁর বৈশিষ্ট্য। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে আপনারা যেহেতু পঞ্চাশের কবিকে সম্মানিত করেছেন, তাই পঞ্চাশের বা পাঁচের দশকের কবিতা নিয়ে স্মারক বক্তৃতা বাঞ্ছনীয় ছিল। সুধাংশুবাবু মণিভূষণ ভট্টাচার্যকে 'ষাটের কবি' না-বলে কেন যে পঞ্চাশের কবি বললেন, বুঝতে পারলাম না। [*সুধাংশুবাবুর প্রবন্ধে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখিত হয়নি।*- সম্পাদক]

নৃপেন্দ্রলাল দাশের 'রবীন্দ্রনাথ ও পদ্মনাথ' শীর্ষক ছোট্ট লেখাটি অনেক অজানা খবর দিয়েছে। ওঁকে ধন্যবাদ। অন্যান্য খবর, লেখক-পরিচিতি ও পত্রাবলি স্মারকগ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

পরিশেষে বলি, কবিদের পুরস্কৃত করার পাশে ভালো প্রাবন্ধিকদের কথাও ভাবতে পারেন। অপ্রচারিত অথচ ভালো কবিরাও কি যুগ্মভাবে সম্মান ও পুরস্কার পেতে পারেন না?

নমস্কার নেবেন। ভালো থাকবেন।

তরুণ মুখোপাধ্যায়

(আট)

বহু তথ্যপূর্ণ

নয়াদিল্লি
২৪.৯.১৩

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য
সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

আমার মতো একজন অপরিচিত ও অখ্যাত ব্যক্তির কাছে স্মারকগ্রন্থ পাঠাবার জন্য ধন্যবাদ। স্মারকগ্রন্থটি বহু তথ্যপূর্ণ।

নমস্কারান্তে

কিরণশঙ্কর মৈত্র

(নয়)

রামনাথের গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ কাম্য

সারদা পার্ক, কলকাতা
২০.১১.১৩

প্রীতিভাজনেষু

রমানাথ, আপনার প্রেরিত 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার এবং রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১২' প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস আমার আকৈশোরের প্রেরণা। এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের বংশধর আপনি ভাবতেই কেমন শিহরন লাগছে। আপনার শিষ্টাচার, ভদ্রতা, কৌলীন্যবোধই পরিচয় দেয় আপনার শিরায় শিরায় উচ্চবংশের নীলরক্ত বইছে। আপনার এই কবিমন যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, দু-চাকায় ভর করে বিশ্বভ্রমণকালে তিনি (রামনাথ) যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই আজ দুষ্প্রাপ্য। আপনি একজন যোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে রামনাথ বিশ্বাসের গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা যদি করেন তাহলে আমরা পাঠক হিসাবে উপকৃত হব।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

অনন্ত দাশ

(দশ)

স্মারকগ্রন্থটি পূর্ণতার রূপ পেয়েছে

১০/০২/২০১৪

শ্রদ্ধেয়
সুকুমার বাগচি মহাশয়,

আপনার সম্পাদনায় রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার এবং রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ২০১২ প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি পড়লাম। এই স্মারকগ্রন্থে যা যা প্রার্থিত তার চেয়েও অনেক বেশি পাওয়া গেল। দুই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের উপর বর্ণিত রেখাচিত্র তথা শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু চক্রবর্তী মহাশয়ের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতাকে ('সমাজ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শংকরদেবের অবদান') আমি প্রবন্ধ বলেই গণ্য করি। এই প্রবন্ধ পাঠে একটা কথাই বার বার মনে হয়েছে যে বাস্তবতার নিরিখে শ্রীমন্ত শংকরদেবের ভক্তি-আন্দোলন ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সার্বিক মূল্যায়ন বর্তমান সমাজে একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমলেন্দুবাবুর বক্তব্যে উঠে এসেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, সংস্কৃতি, সমাজে ভক্তি আন্দোলনের মূল্যায়ন ইত্যাদি। এককথায় অনবদ্য ও তথ্যবহুল।

অন্যদিকে, সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল' শীর্ষক লেখাটি থেকে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারা গেল। বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরতন্ত্র, চল্লিশের দশকের অশান্ত পরিবেশের উত্থানে বেশ কিছু কবিতার পত্রিকা ও কবিতার জন্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমাকে তো ঋদ্ধ করেইছে, সেইসঙ্গে অন্যান্য পাঠকেরও প্রত্যাশা পূরণে সাহায্য করবে বলে মনে হয়। তবে এই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ নির্বাচন নৃপেন্দ্রলাল দাশ মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও পদ্মনাথ' লেখাটি।

স্মারকগ্রন্থে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এবং কবি নীলমণি ফুকন সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন যথাক্রমে ব্যোমকেশ মজুমদার এবং রমানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়। উভয়েই জীবন ও জীবিত মানুষকে জড়িয়ে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার করে অসাধারণ কাব্যরূপ দিতে পেরেছেন। এই দুটো কবিতা পাঠের আনন্দ ভাগ করা যাবে না। এককথায়, আপনার সম্পাদনায় এই স্মারকগ্রন্থটি পূর্ণতার রূপ পেয়েছে এটা বলতেই হবে।

নমস্কারান্তে

বিশ্বজিৎ নন্দী

তুরা, গারো পাহাড়।